সিঁড়ি

সিঁড়ি

নবেন্দু ঘোষ

৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ

২২ শে শ্রাবণ, ১৩৬৪

প্রকাশক

মীরা সেন ও দেবকুমার বসু

চিত্রকর্ম

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বর্ণলিপি

গণেশ বসু

মুদ্রণ

শ্যাম সুন্দর ঘোষ

ঘোষ আর্ট প্রেস

১৩৫এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭

—আড়াই টাকা—

সিঁড়ি

দেবতার জন্ম

জীবিকা

দুর্দ্দিন

তলানি

সিঁড়ি

আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মা ডাকছেন।

"ও বাবা বিমল—বিমল—"

"এ্যাঁ"—

"ওঠ"—

"উ হু"—

মা রেগে উঠলেন, "ছেলে মানুষী করিস না বিমল, ওঠ, সূয্যি যে এদিকে মাথার ওপর উঠল"—

উঠতেই হল। জানালা দিয়ে একঝলক কড়া রোদ এসে ঘরের ভেতর ঢুকেছে, সেদিকে তাকিয়ে তার চোখ জ্বালা করতে লাগল। দুহাতের তালু দিয়ে চোখ রগড়ে সে টাইমপিসটার দিকে তাকাল। না, বেশী বেলা হয়নি, সবে সাতটা দশ।

মুখ বিকৃত করে সে বলল, "ইস্, এখনো একঘণ্টা ঘুমোতে পারতুম"—

মা হাসলেন, "তাহলে বাজারটা কে করবে শুনি ?"

"কেন ? বীরু ?"

"তুই না গেলে হয়ত ও-ই যাবে—কিন্তু ওযে এখন পড়ছে"—

"আচ্ছা বাপু, তবে আমাকেই ঘানিতে জুড়ে দাও—যাচ্ছি"—

"রাগ করিসনি বাবা, চা পাঠাচ্ছি এখুনি"—

মা চলে গেলেন। বিমল হাসল। মা চালাক মেয়ে। মুখ ধুয়ে চা খেতে আরো পনেরো মিনিট লাগল। তারপরেই বৈঠকখানার বাজারের দিকে পা বাড়াল বিমল। কিন্তু বেরোবার আগে মা এসে আবার সামনে দাঁড়ালেন।

"আবার কি হুকুম মা ?"

"একবার ছায়ার ওখানটা হয়ে আসিস। ছোট খুকীটার নাকি জ্বর এসেছিল, এখন কেমন আছে তা জেনে আসিস।"

"আচ্ছা।"

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল বিমল। তেতলা থেকে নীচে। বাড়িটা চারতলা, তাতে চৌদ্দ পনেরো জন ভাড়াটে থাকে। বেশ উঁচু বাড়ি। তেতলা থেকে একতলা পর্যন্ত কম করেও চল্লিশটা সিঁড়ি। খাড়া ও ছোট। নামবার সময় কিছু মনে হয় না কিন্তু ওপরে ওঠবার সময় তা দুর্গম পাহাড় হয়ে ওঠে। কটা ধাপ নীচে নামল সে ? এক—দুই—দূর কি হবে গুণে ?

তাড়াতাড়ি পা চালাল বিমল। একটা ট্রাম ধরতে হবে। মৌলালীর কাছে থাকে ছায়া। ওর স্বামী কোন এক কাগজে বুঝি সাব এডিটরের কাজ করে। অবস্থা সুবিধের নয়। তাতে

বিমলের অবস্থা ও কাহিল হয়ে ওঠে। পাকিস্থান হবার পর থেকে তার অবস্থা আরো সঙ্গীন্ হয়ে উঠেছে। দেশে বিশেষ কিছু ছিল না, সব বিক্রি করে দিয়ে বুড়ো মা বাপ আর ছোট ভাই বোন সবাই কলকাতায় এসে হাজির হয়েছে। বাবা এককালে গ্রামের ইস্কুলে মাষ্টারী করতেন। সে কবেকার কথা। ছোট ভাই বীরু ক্লাশ নাইনে পড়ে, লেখা পড়ায় ভাল। ছোট বোন মায়া বাড়িতে পড়ে, তাকে স্কুলে পড়ানোর মত ক্ষমতা নেই। দেশের ভিটে মাটি বিক্রি করে যা কিছু পাওয়া গিয়েছিল তা তুটো ঘরের সেলামী আর সংসার খরচায় জল হয়ে বেরিয়ে গেছে। ভরসা শুধু সে—বিমল। বৈজনাথ আগরওয়ালার অফিসের এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। ভরসা শুধু দেড়শ' টাকা মাইনে। ট্রাম আসছে। হ্যাঁ, মান্থ্লিটা পকেটে আছে।

ছায়ার বাড়ি এসে পড়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল বিমল। এই বাড়িটাও মস্ত বড়-চারতলা—বহুদিনের পুরোনো। ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে, থমথমে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভারী হয়ে আছে পরিবেশটা। অন্তত কুড়িটি পরিবার মাথা গুঁজে আছে এর ভেতরে। ভীড় কোলাহল, কান্না, চীৎকার, কলহ। এর চেয়ে কুলি-ব্যারাক ভালো।

সংকীর্ণ সিঁড়িটা, ঘন ঘন বাঁক ফিরে ওপরে উঠেছে। পাশাপাশি তুজন চলতে পারেনা, একজন দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালে পরে আর একজন ওঠানামা করতে পারে। সিঁড়িতো নয়, যেন দুর্গম পাহাড়ী পথ। একটু উঠেই দম ফুরিয়ে যায়, নিঃশ্বাসটা ভারী ও সশব্দ হয়ে ওঠে। তবু উঠতে হয়, হাঁটুর

ওপর হাতের ভর দিয়ে, ঝুঁকে ঝুঁকে, দাঁতে দাঁত চেপে। ছ'য়ারা তেতলায় থাকে।

কড়া নাড়তেই ছায়া দরজা খুলল। দাদাকে দেখে হাসল সে। হাসিটা বিচিত্র। যেন অনেক দিন ধরে হাসতে ভুলে গেছে ছায়া। দাদাকে দেখে হাসার চেষ্টা করল।

"ভেতরে এসো"—

"হুঁ"—

"ইস্, এত হাঁপাচ্ছ যে ?"

"রাবণের সিঁড়ি বেয়ে এলাম যে—বাপ্"—

ছায়া আবার হাসল, বলল, "রাবণের সিঁড়িকে ভয় করে যদি নীচের তলায় থাকতাম, তা হলে কি হত জানো ?"

"কি ?"

"যাদবপুরের স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ারও সময় থাকত না।"

বিমল স্তব্ধ হয়ে গেল।

স্তব্ধতা।

ছায়ার দিকে তাকাল বিমল। তার বোনের নাম সার্থক হয়েছে। শুধুই ছায়া সে, কায়াহীন ছায়া। শীর্ণা। চোখের নীচে কি ছায়া আজকাল কাজল পরে ?

"রাখাল বাবু কোথায় ?"

"বাইরে।"

"আপিসে ?"

"না—ধান্দায়।"

ক্লান্তকণ্ঠে কথা বলছে কেন ছায়া ? তার চোখের তারায় অনিদ্রার রক্তিমাভা কেন ?

"ভাল আছিস ছায়া ?"

"আছি।"

"খুকীর নাকি জ্বর হয়েছে ।"

"হয়েছিল, এখন সেরেছে।"

"মা পাঠিয়েছে আমাকে।"

ছায়া হাসল, "মা না পাঠালেন তো আসতে না, না?"

"আসতাম বৈকি, হয়ত অন্যসময়ে। খোকা কই?"

"বাজারে গেছে।"

"আরে আমাকেও তো বাজারে যেতে হবে—উঠি ছায়া, আফিস আছে"—

"বোস"—

"কেন ?"

"চা খাবে না?"

"থাক"—

"না। এক কাপ খেয়ে যাও। রসোগোল্লা সন্দেশ খাওয়াতে পারিনা বলে বুঝি চায়ে মন ধরে না?"

বিমল হাসল, "তোদের সঙ্গে কথায় জিতব আমি? যা চা নিয়ে আয়—কিন্তু পাঁচ মিনিট সময় দিলাম"—

"তাই সই।"

ছায়া রান্নাঘরে গেল। ঘরের চারদিকে তাকাল বিমল। অভাবের ছায়া চারদিকে। সে ছায়া কায়াহীন নয়। বুড়িয়ে গেছে ছায়া। বাইশ বছরেই চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছে সে। আশা। আকাশ-কুসুম, মরীচিকা, হাওয়াই কেল্লা। অমিত জীবন, অফুরন্ত আনন্দ, সাজানো গোছানো লক্ষ্মীমন্ত সংসার—কত স্বপ্ন দেখে মানুষ। বিশেষত মেয়েমানুষ। ছায়াও হয়ত এমনি স্বপ্ন দেখেছিল। চোখের পাতা বুজে

নয়, দুচোখ মেলে, সজ্ঞানে। তার আশা আকাঙ্খা ও স্বপ্নের সিঁড়ি বোধ হয় আকাশকেও পার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হল? কি হল? বাস্তব জগতের ঘাত-প্রতিঘাত। অভাব, ব্যাধি, দুশ্চিন্তা। সমাজ। রাষ্ট্র। দেশভাগ। কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে পুতুল খেলা। কিন্তু আর চলবে না, না—

"দাদা"—

"এনেছিস চা? বেশ"—

তাড়াতাড়ি চায়ে চুমুক দিল বিমল। দেরী হয়ে যাচ্ছে। বাজার যেতে হবে। শুধুই কি বাজার?

"নন্দিতার খবর কি দাদা?" ছায়া কুমারী মেয়ের মত ঠাট্টা করতে চাইল।

বিমল চোখ তুলে হাসল, বলল, "ভালই"।

স্তব্ধতা।

ছায়া প্রশ্ন করল, "শুধু এই—আর—?"

বিমল ইংগিতটা বুঝল, বলল, "ধীরে বোন, ধীরে—অভাবের চোটে দেহপিঞ্জরে প্রাণপাখী যে এদিকে উড়ু উড়ু"

ছায়ার মুখ ছায়াচ্ছন্ন হল।

স্তব্ধতা।

"এবার উঠি ছায়া"—বিমল উঠে দাঁড়াল।

কোন কথা বলল না ছায়া।

বিমল পা বাড়াল, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

ছায়া ডাকল, "দাদা"—

বিমল ঘুরে দাঁড়াল "কিরে?"

ছায়া অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে এক নিশ্বোসে বলল, তোমার কাছে পাঁচটা টাকা আছে?”

বিমল বিবর্ণ হয়ে গেল। টাকা! তাহলে ছায়াদের অবস্থা এখন ভাল যাচ্ছে না!

“আছে। দেব নাকি?”

“দাও, বড় টানাটানি যাচ্ছে”—

“অসুখ বিসুখে খরচ হয়ে গেছে বুঝি?”

“না। ওঁর চাকরি গেছে।”

মাঝে মাঝে ছোট্ট একটা কথা যেন বজ্রপাতের মতই ভয়ঙ্কর মনে হয়। বিষণ্ণ ও উদাস কণ্ঠের ছোট্ট একটা উক্তি অনেক সময় চোখের সামনেকার আলোকে অপহরণ করে, অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয় সব কিছুকে, চেতনার ঝিল্লীরব আনে।

“চাকরী গেছে! কবে? কেন?”

বিমলের কণ্ঠে উদ্বেগ ধ্বনিত হল।

ছায়া বলল, “এই কয়েকদিন আগে—কিন্তু তুমি ভেবনা দাদা, নতুন আর একটি কাগজ বেরোবে, সেখানে ওঁর চাকরী হবে—শিগ্‌গীরই।”

“হু—আচ্ছা, এই নে”—

পাঁচটা টাকা দিয়ে ঘর থেকে বেরোল বিমল। দোরগোড়ায় ছায়া এসে দাঁড়াল। দু’চোখের তারায়, চিন্তাক্লিষ্ট মুখে তার বিয়োগান্ত মহাকাব্যের আভাস। আর ভারী ক্লান্ত তার দাঁড়াবার ভঙ্গীটা। কেন? ছায়ার কি ছেলেপিলে হবে? কে জানে? এই দুর্দিনে, শেয়াল কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে বেঁচে থাকাটাই যখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন আর একটি নবজাতক এসে বাঁচতে চাইবে ও মানুষ হতে

চাইবে? বরাবরই দু পাঁচ টাকা মাঝে মাঝে দেয় বিমল। কিন্তু এবার? চাকরী থাকতেও যাদের কুলোয় না, এখন তাদের কি করে চলবে? না, মনটা খারাপ হয়ে গেল। তেতলা থেকে নীচে। ক'টা সিঁড়ি? নীচে নামতে কোন কষ্ট হয় না। রাস্তা। এবার কোথায়? মনটা ভারী হয়ে গেল। একটি রাজকন্যার প্রাসাদ গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। নন্দিতা। নন্দিতার কাছে সে এবার যাবে। আর একটি রাজকন্যা। সেখানে, একটি রূপসী কুমারীর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে যেন সোনার কাঠির সঞ্জীবনী সুধা! দুটো কথা, দুটো কাজল কালো চোখের বিমুগ্ধ দৃষ্টি, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সুন্দর একটি মোহিনীর ভালবাসা তাকে বাঁচাবে, জীবন সম্বন্ধে নতুন বাণী শোনাবে। ট্রাম আসছে—

একে বেঁকে ওপরে উঠেছে সিড়ি। তেতলা নয়, এবার চারতলায় পৌঁছুতে হবে। এক-দুই-ক'টা ধাপ. উঠলো সে! দূর—কি হবে গুনে? উঠতে কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্টকে কষ্ট বলে মনে হয় না। নন্দিতা যদি আকাশের মেঘলোকে থাকে তা হলেও তার কষ্ট বোধ হবে না। জীবনকে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য মানুষ সব কিছুই পারে। নন্দিতা এখন কি করছে? কি ভাবছে সে? বিমলের কথা?

দরজা। করাঘাত।

নন্দিতার ছোট ভাই এসে দরজা খুলে দিল।

নন্দিতার ঘর।

দক্ষিণের জানালা দিয়ে হাওয়া আসে ঘরটাতে। বেশ লাগে। কিন্তু সেই সমুদ্র প্রত্যাগত হাওয়া না থাকলেও বেশ লাগত। কারণ ঘরটা নন্দিতার। বিমলের নন্দিতা

পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, জীবনের সমস্ত মাধুর্যের প্রতীক নন্দিতা।

নন্দিতা এল।

"হঠাৎ এই সকালে যে—আপিস নেই ?"

"আছে।"

"তাহলে ?"

"এটা তো মিথ্যে নয় যে তুমিও আছ।"

নন্দিতা হাসল। তার সুবিন্যস্ত দাঁতগুলোতে যেন মুক্তোর দীপ্তি চিক্‌চিক করে উঠল, দু'গালে দুটি টোল পড়ল। সে বলল, "তোমার সঙ্গে কথায় পারবো না আমি।"

বিমল হাসল, "মাত্র একটি বিষয়ে হার মানলে তুমি—আর বাকী সব বিষয়ে যে আমি হার মেনেছি—"

নন্দিতার চোখের তারায় একটা আশ্চর্য আলোর আভাস। দক্ষিণের হাওয়ায় তার মাথার চুল ওড়ে, আঁচল ওড়ে। লালচে ঠোঁটের কোনে দেখা দেয় সলজ্জ মৃদু হাসি। কোন দেশের রাজকন্যা নন্দিতা ?

"ওহে বাক্যবীর, চা খাবে ?"

"এই মাত্র খেয়ে এলাম যে—ছায়ার ওখানে।"

"তাতে কি ? অমৃতে অরুচি হবে কেন ?"

"অরুচি হবে না—কিন্তু তুমি যেতে পারবে না।"

"কেন ?"

"তোমায় দেখব বলে এলাম যে !"

"তা হলে দেখ।"

"নন্দিতা—"

"উঁ"—

"এই শ্রাবণেই দিন ঠিক করব না অঘ্রাণ মাসে ?"

"তোমার কি ইচ্ছে ?"

"শ্রাবণ মাসেই—আজই—আর পারছি না—"

"আহা বেশতো বাপু, সবাইকে বলে মত নাও"—

"আজই বাড়ীতে কথা বলব—তার পর"—

"তারপর ?"

"আমরা দুজনে।"

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দু'জনে তাকাল। নন্দিতার মা নারায়ণী আসছেন, তাঁর হাতে এক কাপ চা ও বিস্কুট। নান্দিতা দূরে সরে গেল। বিমল উঠে দাঁড়াল।

"বোস বাবা-বোস, চা খাও"—

বিমল বসল, নিঃশব্দে একটা বিস্কুটে কামড় দিল, চায়ে চুমুক দিল।

"তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে বাবা"—

"বলুন"—

নন্দিতা লঘুপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নারায়ণী বিছানার একপাশে বসলেন, বললেন, "নন্দিতার বিয়ের বিষয়ে বলছি—"

"বলুন।"

"একটি ভালো পাত্রের কথা বলছিলেন ওঁর আপিসের বন্ধু, ছেলেটি নাকি দু'শো-টাকা মাইনে পায়"—

হৃদপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে গলার কাছে এল। আবার কি ছোট একটা কথা বজ্রপাতের মত ভয়াবহ হয়ে উঠবে ?

নারায়ণী বললেন, "কিন্তু আমাদের তা ইচ্ছা নয়, তোমাকেই আমরা মনে মনে বরণ করে নিয়েছি বহুদিন আগে। তবে

ব্যাপার কি জানো বাবা, দিনকাল খারাপ, আমরাও বুড়ো হয়ে পড়ছি—আর দেরী করতে তো ভরসা হয়না”—

মৃদুকণ্ঠে বিমল বলল,“আপনার কথাগুলো যুক্তিপূর্ণ। আমি আজই বাড়ীতে এ বিষয়ে নিষ্পত্তি করে ফেলব—শ্রাবণ মাসেই যা'তে”—

নারায়ণী ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, “তাই করো বাবা তাই করো, তোমাদের দুজনকে পাশাপাশি দেখে আমি নিশ্চিন্ত হই। আচ্ছা বাবা, আমি রান্নাঘরে যাই, তুমি চা খাও। কাল কিন্তু এসো, কেমন ?”

“আজ্ঞে আচ্ছা—”

নারায়ণী চলে গেলেন।

দক্ষিণের বাতাস আসছে ঘরের ভেতর। কিন্তু মাথার ভেতর লাভাস্রোত। এই মাসেই, যত শিগ্‌গীর হোক, যে ভাবেই হোক। নন্দিতাই তার পৃথিবী, তার জীবন।

“মা গেছেন ?”

নন্দিতা ঘরে এল।

জবাব দিলনা বিমল। শুধু নিষ্পলকনেত্রে সে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে রইল। এই দু'তিন মিনিটেই সে শাড়ীটা পালটে এসেছে। মাদ্রাজী বুটিদার শাড়ীর চলন হয়েছে আজকাল। পরে এসেছে নন্দিতা। হাল্‌কা গোলাপী রংয়ের জমি। চমৎকার মানিয়েছে তাকে। পরিপুষ্ট দেহের রেখাগুলো যেন আরো মাদকতাময় হয়ে উঠেছে। মুহূর্তে ঘরের মধ্যে যেন একটা ঐন্দ্রজালিক আবহাওয়া সৃষ্ট হয়, বর্ষাকালীন দক্ষিণের বাতাসে যেন বসন্তের বার্তা ঘোষিত হয়। পৃথিবীকে

সুন্দর মনে হয়, জানালা দিয়ে দৃশ্যমান আকাশের রঙকে মনে হয় গাঢ় নীল।

"কি দেখছ" ?

"তোমাকে"।

"বাবা দিয়েছেন কাল। কি রকম দেখাচ্ছে বলনো"।

"অপূর্ব।"

নন্দিতা কাছে এল, এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "মা কি বলছিলেন ?"

বিমল হাসাল, বলল,"তোমাকে তাড়াতাড়ি হরণ না করলে এক অনার্যের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।"

"ধ্যেৎ—"

"হ্যাঁ—ভালো পাত্র। আমি দেড়শ' টাকা কিন্তু সে দু'শো টাকা"।

নন্দিতার মুখ কালো হয়ে গেল, সে বিড়বিড় করে বলল, "তুমি লক্ষ টাকা"—

স্থানকাল কি মনে থাকে সব সময়ে ? হঠাৎ নন্দিতাকে বুকে টেনে নিল বিমল, লোভীর মত চুমু খেল তার ঠোঁটে, বলল, "আর তুমি সমস্ত পৃথিবী। তোমাকে আমি হারাতে পারিনা নন্দিতা—এই মাসেই বিয়ে হবে আমাদের" —

নন্দিতা চোখ বুজল, বলল, "তাই যেন হয়—আমিও আর দূরে থাকতে পারছিনা। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো—মাঝে মাঝে আমি কাঁদি"—

দেরী হয়ে গেছে।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল নন্দিতা।

"যাই"—বিমল বলল।

"এসো। আবার কখন আসবে ? বিকেলে ?"

"তোমার মা কি ভাববেন" ;

"তুমি এসো, মা ভাবলেই বা ?"

'লজ্জা করে'—

"একটু নির্লজ্জ হও।"

"আসব।"

"এসো কিন্তু" —

"আসব।"

একে বেঁকে নেমেছে সিঁড়িটা। তাই নন্দিতাকে আর দেখা যায়না। ক'টা ধাপ নামল সে ? এক-দুই-কি হবে গুনে ? দুশো টাকা মাইনে পায় লোকটা। বটে ! সে যদি দেরী করে তাহলে হয়তো নন্দিতার বিয়ে এই লোকটার সঙ্গেই ঠিক করবে তার বাবা। বটে ! কিন্তু তার আগেই কিস্তিমাৎ করবে সে, তাছাড়া নন্দিতার হৃদয়ে তো সে-ই আছে। দেড়শ' টাকা মাইনে। সংসারের বোঝা আছে, ছায়াদের মাঝে মাঝে সাহার্য্য করা আছে। তাহোক, সে কি ঠিক চালিয়ে নেবে। একটা দুটো মাষ্টারী স্থুরু করবে সে। ওদিকে বীরু লেখাপড়ায় ভালো পাঁচ সাত বছরেই তো সে সংসারকে সাহায্য করার মত ক্ষমতা অর্জন করবে। তারপর একটা ব্যবসা। তাছাড়া তার মাইনেও তো বাড়বে। না, হারাব না সে জিতবেই। সুখী সংসার, পরিতৃপ্ত জীবন, ভালবাসা, সন্তান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা। কত রংয়ের ছবি ! স্বপ্ন। তার আশা আর আকাঙ্খায় সিঁড়ি এক দিন সত্য হয়ে উঠবে, একদিন তা আকাশকেও পার হয়ে যাবে। নন্দিতা। তার স্পর্শে এখনও লতার মত দেহ জড়িয়ে আছে, ঠোঁটের ওপর ছড়িয়ে আছে তার ঠোঁটের উত্তাপ

কতদিনের ভালবাসা তাদের। প্রবাল দ্বীপের মত তিল তিল করে গড়ে উঠেছে। কে তাদের বিচ্ছিন্ন করবে? ক'টা বাজল? দেরী হয়ে গেছে। বাজার করে আপিস পৌঁছুতে হয়ত পাঁচ দশ মিনিট লেট হয়ে যাবে সে। তাহোক! আজ একটা জরুরী মিটিং আছে। নতুন ইউনিয়ন গড়তে হবে আগরওয়ালার হেড অপিসে। নন্দিতা। সে কি অপ্সর লোকের রাজকন্যা?

না। লেট হয়নি সে। ঠিক সাড়ে দশটাতেই সে রেজিষ্টারে সই করতে পারবে। এখনো কর্মচারীরা আসছে। পাঁচ তলার সমস্ত ঘরগুলো জুড়ে তাদের অফিস। বৈজনাথ আগরওয়ালার সাম্রাজ্য। জুট মিল, অয়েল মিল, কোলিয়ারী, কাপড়ের এজেন্সী, বিলেত থেকে রকমারী জিনিষ আমদানী—নানা রকমের ব্যবসা করে বৈজনাথ। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়স লোকটার। আর মাত্র দশ বছরেই সে ভোজবাজীর কসরৎ দেখিয়েছে।

লিফ্‌ট আছে। কিন্তু তা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য নয়। তাই চরণ যুগলের সাহায্যেই ওপরে উঠতে হয় প্রতিদিন। সেই পাঁচতলা, উঠতে রীতিমত কষ্ট হয়। কিন্তু উপায় কি? এ বিষয়ে আরো একজন কর্মচারী তার সহযাত্রী। আজ মিটিং আছে। বিকেলে। ভাতা হিসাবে আরো টাকা চাই। প্রতি বছরে যেখানে আধকোটি টাকা মুনাফা হয় সেখানে আরো কিছু প্রাপ্য আছে তাদের।

এঁকে বেঁকে ওপরে উঠেছে সিঁড়িটা। চওড়া প্রশস্ত। মস্ত বড় বাড়ীটা। অন্যান্য তলাতেও নানা মার্চেন্ট অফিস আছে। গিজগিজ করছে লোকে। কোলাহল। ব্যস্ততা। সিঁড়ি আর ফুরোয় না। আজ বিয়ের বিষয়ে সব ঠিকঠাক করবে বাড়ীতে

গিয়ে। সবই তো ঠিক, শুধু বলাটাই বাকী। তারপর নন্দিতার ওখানে যাবে সে। বারবার বলেছে সে। 'এসো কিন্তু', 'আসব সিঁড়ি কি আর ফুরাবে না? রাবণের সিঁড়ি নয়, মহা-রাবণের সিঁড়ি। ক'ধাপ? কি হবে গুনে? বিয়ে! নন্দিতার। বিয়ে। সংসার, সুখ, শান্তি। সিঁড়ি শেষ হয়েছে।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল। বড় বড় ফাইল। কাজ সুরু হয়।

বন্ধু অজিত এল এক ফাঁকে, বলল, "আমাদের টিফিন রুমেই মিটিংটা হোক, কি বল?"

বিমল মাথা নাড়ল, "বেশ তো তাই হোক।"

"সবাই কিন্তু আসবে না।"

"তা তো আসবেই না। যারা ভীরু আর যারা খুশী তাদের তুমি পাবে কেন?"

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল। কাজ করতে করতে ভাবে বিমল। বাবার জন্য একটা কবিরাজী ওষুধ নিতে হবে। বাতের জন্য। বীরুর একটা বই কিনতে হবে। মাস শেষ হতে আরো দশদিন। চলে যাবে। ছায়ার ওখানেও যেতে হবে। রাখাল বাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, তাদের আসল অবস্থাটা জানতে হবে। দিনকাল খারাপ, একটা কিছু কাজ না জুটে তো বিপদ হবে। দেশের দুর্দিন এসেছে। দেশভাগ। মাকে হঠাৎ পর ভাবা যায়? কাগজের মানচিত্রে দাগ কাটলেই কি মনের মানচিত্রে দাগ পড়ে? ছুরি দিয়ে মাটি কাটলেই কি নাড়ীর বন্ধন কাটা যায়? পাপ। তবু হাল বাইতে হবে, তবু এগোতে হবে। দিন আসবেই।

ঘড়ির কাঁটা নির্ভুল চলে।

বৈজনাথ আগরওয়ালের বিরাট কারবার। অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা আর ইংলণ্ড থেকে আসে নানা জিনিষপত্র। তার জুটমিলের তৈরী মাল যায় দেশে বিদেশে। সারা বাংলা দেশকে কাপড় পরায় সে, সারা ভারতবর্ষকে কয়লা আর তেল জোগায়। লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাব। ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কে টাকা আসে আর যায়। কত টাকা?

বেলা একটা।

অফিসের একজন পিয়ন এল একটা চিঠি নিয়ে। সঙ্গে পিয়ন বুক।

"সহি করকে ইয়ে চিঠ্‌ঠী লিজিয়ে বাবু"—

"নিচ্ছি"—

সই করে খামটা নিল বিমল। তার নামে চিঠি! অফিস থেকেই দিয়েছে। ইন্‌ক্রিমেণ্টের ব্যাপার নাকি?

চিঠিটা খুলল সে, পড়ল, আবার পড়ল। আবার পড়ল। না, চোখের ভুল নয়।

হেড ক্লার্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "কি করা যায় স্যর?"

হেড ক্লার্ক মাথা নাড়লেন, "মালিকের সঙ্গে দেখা কর— তাছাড়া অন্য উপায় নেই"—

তাই গেল বিমল।

দারোয়ান নাম লিখে নিয়ে ভেতরে গেল। মিনিট খানেক বাদেই আবার বেরিয়ে এল সে।

"কি হল তেওয়ারী—যাব?"

"নেহি।"

"আর কেউ আছে বুঝি?"

"জী নেহি। হুজুরনে কহা কি আপ্‌সে নেহি মিলেঙ্গে"—

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বিমল। এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে পকেট থেকে চিঠিটা বের করে আর একবার নজর বুলোল, তারপর সোজা ক্যাশিয়ারের সামনে গিয়ে চিঠিটা তাঁর সামনে রাখল।

ক্যাশিয়ার বিচলিত হলেন, বললেন "বোস, বোস বাবা"

বিমল বসল।

"ধরপাকড় করো, বুঝলে?"

"বুঝেছি, কিন্তু ফল হবেনা। গিয়েছিলাম দেখা করতে, দেখা করবেন না।"

"তাহলে তো বিপদ—"

নিঃশব্দে টাকা গুনতে লাগলো ক্যাশিয়ার।

কথাটা ছড়িয়ে গেল মুহূর্তে।

জন কয়েক কাছে এল। নিঃশব্দে, সহানুভূতি ভরা দৃষ্টি মেলে তারা তাকিয়ে রইল তার দিকে। অসহায় পশুর মত।

অজিত বললে, "তোর জায়গায় আমি দাঁড়ালাম"—

বিমল হাসবার চেষ্টা করল, নিঃশব্দে।

কথাবার্তা, চলাফেরা, কলিং বেলের শব্দ, নীচের তলার কোলাহল, দিনের বেলাকার গুঞ্জনমুখর মহানগরী তবু কি অদ্ভুত নিঃশব্দতা তার চারিদিকে।

বুড়ো ক্যাশিয়ার এক মাসের অগ্রিম মাইনেটা গুণে গুণে দিল। চিত্রগুপ্তের মত।

কিন্তু পৃথিবীর এই চিত্রগুপ্তের চোখে একটু জল দেখা দিল।

"আমরা বুড়ো হয়েছি বাবা, মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে—তাই লাথি খেয়েও চুপ করে থাকি। কিন্তু তোমার—তোমাদের জ্বলন্ত চোখের সামনে আছে,বিরাটভবিষ্যৎ—আমাদের পাপকে তোমরা দূর করো"—

ভবিষ্যৎ? বিমল হাসবার চেষ্টা করল, পারলনা। তবু ক্যাশিয়ারবাবুর কথা তো মিথ্যে নয়।

ঘড়ির কাঁটা ঠিকই চলে। নির্ভুল।

বেরিয়েই আসতে হল।

এঁকে বেঁকে নীচে নেমেছে সিঁড়িটা। অন্যান্য দিন নামতে কষ্ট হয়না, কিন্তু আজ যেন নামতেই পারছেনা সে। লক্ষটাকার অংকটা এক আঁচড়ে কেটে দিয়েছে বৈজনাথ আগরওয়ালা। এবার? এরপর? বুড়ো বাপ, বুড়ী মা, ভালো ছাত্র বীরু, বেকার ভগ্নীপতি, ছায়া আর সে? সর্বোপরি নন্দিতা। আজ কি সে যাবে তাদের বাড়ী? যেতে পারবে? গেলে কি বলবে সে নারায়ণীকে? কি জবাব দেবে সে? কোন তারিখের কথা বলবে? কুবেরেরই তো ভয় বেশী। যে ভীরু সে-ই তো সর্বাগ্রে আঘাত করে। কিন্তু নীচে তো আজ নামা যাচ্ছে না। নীচে যেন অতলস্পর্শী খাদ। যেন অন্ধকার পাতাল। নীচে নামবার সিঁড়িটা তো আর নেই! নন্দিতা, বিয়ে, সংসার,সুখ,শান্তি,ভাইকে উপযুক্ত করা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠা। ওপরে যাওয়ার সিঁড়িও যেন মুহূর্তে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে, ধুলো হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। তাহলে অনার্যই জিতল নন্দিতা! কিন্তু বিমলের কি হবে? পৃথিবীকে হারিয়ে কি পৃথিবীর মানুষ বাঁচতে পারে? বল, বল নন্দিতা—

হঠাৎ কি যেন হল। আর পা বাড়াতে পারলনা বিমল, মাথাটা ঘুরে গেল তার, শরীরটা দুলতে লাগল, শক্ত করে দেওয়ালটা আঁকড়ে একটা ধাপের ওপর সে বসে পড়ল। তার পায়ের তলা থেকে যেন সিঁড়িটা ভেঙ্গে যেতে লাগল, কানের পাশে ভূকম্পনের শব্দ ভেসে এল আর চোখের দৃষ্টিটা ঝাপ্সা হয়ে উঠল।

সেই স্তিমিত ও আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে একবার ওপরের দিকে তাকাল বিমল। ওখানে ঘড়ির কাঁটা একই ভাবে চলবে, লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার হিসেবের খাতায় ওখানে রোজই আয় ব্যয়ের অঙ্ক লিখিত হবে, আঁকা বাঁকা এই সিঁড়ির ওপর দিয়ে আগরওয়ালার ক্রীতদাসেরা নিত্য দুবেলা ওঠানামা করবে। বিদূষকেরা প্রতিদিনই কান্না চেপে হাসবে।

নড়তে পারল না বিমল। মনে হল যেন সে সিঁড়িটার গায়ে মিশিয়ে আছে, যে সিঁড়িটার ওপরে রয়েছে আগরওয়ালার কুবেরপুরী তার প্রতিটি ধাপেই যেন তার হাড়মাংস জড়িয়ে আছে।

দেবতার জন্ম

মনে মনে শহরকে গাল পাড়ে গণপতি।

সেই সকাল থেকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে সে। কাঁধে ভার—বাঁকের একদিকে শিউজী, অন্যদিকে তার ছেঁড়া জামা-কাপড়ের পোঁটলা। ইহলোক আর পরলোককে ঘাড়ে বয়ে প্যারেলের রাস্তায় অন্ততঃ তিন-চার মাইল হেঁটেছে সে। দোরে দোরে গিয়ে হাঁক পেড়েছে। জাগ্রত শিউজীকে দর্শন করার জন্য সবাইকে আহ্বান করেছে। তেল-সিঁদুর-লাগানো, ফুলে-ঢাকা সেই মসৃণ, চকচকে কালো গোল পাথরটাকে দেখিয়ে উচ্চকণ্ঠে তার অদ্ভুত আবির্ভাব-কাহিনীকে ঘোষণা করেছে। দোরে দোরে। সেই সকালে বেরিয়েছে আর এখন সূর্য উঠেছে মাথার ওপর। গরম। হাওয়া পর্যন্ত তেতে গেছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, খিদেয় পেট পাকাচ্ছে। ঘামে তার কুর্তা আর পাগড়ী ভিজে উঠেছে। কিন্তু এত ঘুরেও লাভ হয়নি তার। মাত্র দু-পয়সা পেয়েছে সে।

মনে মনে গাল পাড়ে গণপতি। এত বড় বোম্বাই শহর, অগণিত এই অট্টালিকাশ্রেণীতে কত লক্ষ লক্ষ লোকের বাস। কিন্তু কোথায়? মিল ফ্যাক্টরীর কালো ধোঁয়ায় কলঙ্কিত এই শহরে দেবতার কোন সম্মান নেই। নাস্তিক শহর। নিষ্ঠুর, উদাসীন, স্বার্থপর শহর। শা-লা।

একটা গলি। গলির মুখে একটা অশত্থ গাছ। আঃ, কী ঠাণ্ডা, কী স্নিগ্ধ তার ছায়া! নাঃ, এখানেই একটু জিরিয়ে নিতে হবে। গণপতি তার বাঁক নামাল।

বসল সে। পাগড়ীটা খুলে মাথাটা চুলকোল বারকয়েক, তারপর কুর্তার পকেট থেকে সন্তর্পণে একটা দেশলাই আর বিড়ি বের করল। একটা আধপোড়া বিড়ি। এরপর আবার কখন বিড়ি কিনবে সে কে জানে।

একটানে বুকের ভেতরটা আলোড়িত করে তুলল গণপতি, তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, "আ —" নেশার আমেজে তার লালচে চোখের ওপর একটা পাতলা জলের পরদা চিকচিক করে উঠল। খাটো, বেঁটে, রোগা শরীরটাকে গাছের গুঁড়িতে এলিয়ে দিয়ে সে সামনের বড় রাস্তাটার শেষ প্রান্তের দিকে তাকাল। দুপুরের রোদ পিচের ওপর মরীচিকার সৃষ্টি করেছে। যেন রৌদ্রালোকেয় উগ্র আত্মা থরথর করে কাঁপছে।

কিন্তু রাস্তা দেখেও দেখে না সে। রাস্তাটা ছাড়িয়ে, নানা রংয়ের বাড়িগুলোর ওপরকার আকাশ যেখানে ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে থেমেছে সেই দিগন্তেরও ওপারে তার গ্রাম।

পশ্চিম দিকে মেঘ-ছোঁয়া পাহাড়ের ঢেউ ; দক্ষিন দিকে পুণা সেই গ্রামে তার ধানক্ষেত ছিল, ঘর ছিল আর ঘরে ছিল বৌ। শান্তা। শ্যামবর্ণা, শক্ত সমর্থ শান্তা সুন্দরী ছিল না কিন্তু শ্রীময়ী ছিল। রুচি ছিল মেয়েটার। সস্তা, মোটা খস্‌খসে শাড়িটাকেই সে কী সুন্দর ভঙ্গীতে পরত! মনের আনন্দ উপচে পড়ত তার, কী এক রসের জোয়ারে যেন অনবরত ডগমগ করত সে. সারাক্ষণ কাজ করতে করতে গুন্ গুন্ করত। কিন্তু হঠাৎ একদিন শান্তার সেই ভ্রমর-গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঐ শিউজীর বিগ্রহই ছিল তার পরিবর্তনের কারণ। সহ্য করতে পারত না শান্তা. উঠতে বসতে ঝগড়া করত সে গণপতির সঙ্গে। অথচ গণপতির কি দোষ? জাতে ব্রাহ্মণ, ঠাকুরদেবতার পূজো করেই তাদের দিন কাটত। জমিজায়গা এককালে প্রচুর ছিল কিন্তু ঠাকুর্দা তা উড়িয়ে শেষ করেছিল। গণপতির বাবা দামোদর হঠাৎ স্বপ্নে একদিন শিবের দর্শন পায়। শিব তাকে পশ্চিম পাহাড়ের পাদদেশে একটা বটগাছ তলায় ঐ মসৃন, কালো গোল পাথর হয়ে ধরা দেন। দামোদর বাড়িতে এনে তুলল শিবকে। গ্রামে গ্রামান্তরে রটে গেল সে খবর। ফলে গণপতির ছেলেবেলাটা ভালোই কেটেছিল। দামোদর মারা গেলেও তিন বিঘে জমি রেখে যায় ছেলের জন্য। তাই নিয়ে গণপতির মোটামুটি ভালোই কাটছিল। বয়স হতেই নিজে পছন্দ করে শান্তাকে বিয়ে করে ঘরে আনল সে। আর ঠিক তখন থেকেই ভাগ্য পরিবর্তন শুরু হল তার। স্বপ্নে নির্দেশ দিয়ে স্বেচ্ছায় যে শিব ধরা দিয়েছিলেন তিনি আর ভক্তবৃন্দদের তেমন আকৃষ্ট করতে পারলেন না, আকৃষ্ট করলেও দক্ষিণা

আদায় করতে পারলেন না। সৌখিন শান্তার গুনগুনানি তাই দু' বছর বাদেই বন্ধ হয়ে এল। ইতিমধ্যে ধার হয়েছিল অনেক। সাহুকার তকে তকে ছিল। একদিন ঋণের দায়ে সমস্ত জমি দখল করে নিল সে। পুরানো জীর্ণ বাড়ী আর শিবঠাকুর ছাড়া আর কোন সম্পত্তিই রইল না। শান্তা বকাবকি শুরু করল, তার শাড়ী ছিঁড়তে আরম্ভ করল, তেলের অভাবে মাথার চুল রুক্ষ হয়ে উঠল, মেজাজ হল খিটখিটে। তবু গণপতি ভ্রূক্ষেপ করল না। শিবঠাকুর পরীক্ষা করছেন ভেবে সে নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুর পূজো নিয়ে পড়ে রইল। গাঁয়ে অন্য পুরুত আছে, তাছাড়া সে লেখাপড়া জানে না বলে অন্য উপায়ে দু-পয়সা রোজগার করতে পারল না। শান্তা এবার চেহারা পালটাল। গালিগালাজ শুরু করল সে। ঐ শিবঠাকুরকে ফেলে দিয়ে যে কোন একটা কাজ নিতে বলল। কিন্তু অন্য কাজ গণপতি করবে না। কি কাজ করবে? পাথর কাটবে, হাল চালাবে—উঁহু। ওসব কুলির কাজ তার দ্বারা হবে না। দু-চোখে আগুন জ্বলল শান্তার, বলল সে, 'হবে না? আচ্ছা বেশ।' তার দিন কয়েক পরে হঠাৎ শান্তা বাড়ী থেকে উধাও হয়ে গেল। তারপর—

"এই কাকা—তোমার ঝুড়িতে ওটা কোন্ ঠাকুর?" গণপতির চমক ভাঙল। আট-দশ বছরের চার-পাঁচটি ছেলে এসে তার ভারের দিকে তাকিয়ে দেখছে। তাদের চোখে কৌতুহল।

গণপতি গম্ভীরভাবে বলল, "শিউজী।"

একটা ছেলে বলল, "শিউজী! তোমার ঐ ঝুড়ির মধ্যে!"

গণপতি চোখ পাকাল, "তাতে দোষটা কিরে বাচ্চা? ভগবানের পক্ষে সবই সম্ভব বুঝলি?"

ছেলেরা ভক্তিভরে মাথা নাড়ল।

তবু একটা ছেলে বলল, "কিন্তু ওটা তো একটা পাথরের টুকরো মনে হচ্ছে"—

গণপতি বিরক্ত হয়ে উঠল, তবু ত্রিকালদর্শী সাধুর মতো মাথা নেড়ে বলল, "ছিছিছি, অমন কথা বলিস না বাবা—এ আমার জাগ্রত শিব। তবে শোন্"—

সাড়ম্বরে সে দামোদরের শিবপ্রাপ্তির কাহিনীটা শোনাতে আরম্ভ করল। সে তার বাপের কাছে যা শুনেছিল তার ওপর নানা রং ছড়িয়ে এক আশ্চর্য কাহিনী তৈরি করেছে। হাত নেড়ে নেড়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে সে তা শোনাল। শুনতে শুনতে ছেলেদের চোখে ভয় আর ভক্তি দুই দেখা দিল।

একজন হাতজোড় করে প্রণাম করে ফেলল শিউজীর উদ্দেশে, তারপর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, "হাঁ করে দেখছিস কিরে? প্রণাম কর, নইলে পাপ হবে।" সবাই প্রণাম করল।

গণপতি প্রসন্ন হয়ে হাসল, "শিউজী তোদের কল্যাণ করবে—তা বাবারা ঠাকুরের দক্ষিণা?

পয়সার নামে বিগড়ে গেল একজন, "দূর শালা - এ যে 'বাগুল্' বকছে!"

প্রথম ভক্তিমান ছেলেটি প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা পয়সা বের করে বলল, "এই নাও কাকা—আর নেই।"

এক পয়সা! মুখ বিকৃত করল গণপতি। একবার ভাবল

যে তাড়িয়ে দেয় ছেলেগুলোকে কিন্তু পরমুহূর্তেই হাত বাড়িয়ে বলল, "দে—"

সামনে দিয়ে লোকজন যাচ্ছিল।

গণপতি তাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করল, কিন্তু ফল হল না। বেশীর ভাগই তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল, বাকী সবাই তাকাল না পর্যন্ত।

"শালারা—নরকের কীট সব, ঠাকুর দেবতা মানে না।" খিদে আর রাগে অতিষ্ঠ হয়ে গণপতি আবার বাঁক ঘাড়ে তুলে গলির দিকে পা বাড়াল। দেখা যাক্, আজ পেটটা ভরে কি না।

এ গলি। সে গলি। পথের শেষ নেই।

কিন্তু জোটে না কিছু। ঘাড়ের ওপর বাঁকটা যেন কেটে বসছে এবার।

তবু চলে সে। চলতে চলতে আবার মনে পড়ে। কত খুঁজেছিল সে শান্তাকে। কিন্তু কোন খোঁজ পায়নি, কেউ বলতে পারেনি, কেউ বলতে পারেনি। শুধু হেসেছিল সবাই তারপর জীর্ণ বাড়ীর জীর্ণতা ক্রমেই বেড়ে চলল, তার শূন্যতা শ্বাসরোধী হয়ে উঠল। কত রাতে ঘুম ভেঙে গেছে, ঘরের ভেতরকার নিঃসঙ্গতা অন্তহীন অন্ধকার হয়ে তার বুকের ভেতর তোলপাড় করে তুলছে, কান্না পেয়েছে তার। তবু দিন কাটতে লাগল। বাড়ীর চালা ঝুলে পড়ল, দেয়াল ধ্বসতে আরম্ভ করল, শিউজীর অলৌকিক মাহাত্ম্য ম্লান হয়ে আসতে লাগল, শান্তার স্মৃতিও সহনীয় হয়ে উঠল। তিন বছর কেটে গেল। শেষে আর চলে না, এক বেলা পেট ভরানোও মুশ্কিল হয়ে

পড়ল। উপায় না দেখে বিগ্রহ ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ল গণপতি। মস্ত বড় পৃথিবী, এই বিগ্রহ দেখিয়ে নিশ্চয়ই চলে যাবে তার।

'শিউজীকে দর্শন করো বাবারা— দেবতার ভোগের জন্য কিছু দান করো, শিউজী তোমাদের মঙ্গল করবেন"—গণপতি একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করল। কিন্তু কোন সাড়া এল না।

শা-লা। দেবতাদের ভুলে গেছে এই ছুনিয়া। ছু-বছর ধরে সে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সর্বত্র একই ইতিহাস। মাঝে মাঝে ছু'একজন ধর্মপ্রাণ নরনারী তাকে যথেষ্ট খাতির করেছে বটে কিন্তু সে কজন?

"জাগ্রত শিউজী বাবা—একটু ভোগরাগের ব্যবস্থা করো বাবা"—

আর একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে চেঁচাল গণপতি। একজন লোক বেরিয়ে এল, চোখে মুখে তার রাগ।

"এই—ভাগো এখান থেকে"—

"জাগ্রত শিউজী বাবা"—

"যা যা—ব্যাটা ভণ্ডামীর আর জায়গা পায়নি"—

"ভণ্ড!" গণপতি চেঁচিয়ে উঠল, "নাস্তিক বিধর্মী কোথাকার"—

লোকটা লাফিয়ে এল, "তবেরে শালা"—

গণপতিও ক্ষেপে গেল, "খবরদার শালা, গাল দিলে একেবারে খুন করে ফেলব।"

লোকটা মোটেই ভয় পেল না, এগিয়ে এসে ধাক্কা দিল গণপতিকে। গণপতি বাঁক নামিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল

লোকটার ওপর। তার এতদিনকার নিঃসঙ্গ জীবনের ক্ষোভ যেন হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আক্রোশ হয়ে ফেটে পড়তে চাইল। কিন্তু পাড়ার লোক জড়ো হয়ে তাকে চড় চাপড় মেরে ঠাণ্ডা করে দিল।

"যা ভাগ শালা—জাগ্রত শিউজী না হাতী। দিনে সাধু সেজে পথ ঘাট দেখে যে রাতে চুরি করার মতলবে ঘোর তা কি আমরা বুঝি না?"

এতগুলো লোক, সে একা কি করবে? হেরে যাওয়া কুকুরের মতো পালাল গণপতি।

একপাশে একটা পুকুর। তার পাশ দিয়ে একটা গলি গেছে রাস্তাটার দিকে। পুকুরের ডানদিকে, বড় রাস্তাটার মুখোমুখি একটা মস্ত বড় বাড়ী উঠেছে। অন্তত পঞ্চাশ ষাট জন লোক কাজ করছে।

সেই নতুন বাড়ীটার কাছাকাছি একটা গাছ তলায় বসল গণপতি। বাঁকটা নামিয়ে ঘাম মুছল, পাগড়ী খুলল। ডান পাঁজরার দিকে একটু টনটন করছে। এক ব্যাটা ঘুষি মেরেছিল। মনটা খারাপ লাগে। মারল তাকে! অন্যায় করেনি সে, পাপ করেনি, তবু!

খিদে পেয়েছে। কিন্তু তিন পয়সা দিয়ে কিইবা হবে? তার চেয়ে চানা খাওয়া যাক। তার সংসারের ঝুড়ি খুঁজে একটা কৌটো বের করল গণপতি। এক মুঠো চানা আছে এখনো। কাছেই একটা কল ছিল, জল নিয়ে এসে একটা টিনের বাটিতে তা ধুয়ে ভিজিয়ে নিয়ে একটু চিটে গুড় দিয়ে খেতে আরম্ভ করল।

একটা মোটাসোটা দাগী কুকুর এসে কাছাকাছি বসল। লালা-ঝরানো জিভ বের করে গণপতির চানা-খাওয়া দেখতে লাগল।

চানা চিবোতে চিবোতে কুকুরটাকে দেখতে লাগল গণপতি দেখতে দেখতে রাগ হল তার। নিজের জীবনকে আবার মনে পড়ল তার। অভাব, শান্তার পালিয়ে-যাওয়া, দিনের পর দিন পথ হাঁটা, মার খাওয়া।

হঠাৎ একটা ঢিল তুলে নিয়ে সে কষে মারল কুকুরটার গায়ে, "শা—লা"—

তীব্র একটা আর্তনাদ করে কুকুরটা পালিয়ে গেল, অনেক দূরে গিয়ে সে দাঁড়াল আর গণপতির দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল।

"মিছিমিছি কুত্তাটাকে মারলে কেন বাবা ?"

গণপতি তাকাল পেছন দিকে। কয়েকজন কুলি মেয়ে পুরুষ এসে কাছাকাছি বসেছে। সঙ্গে খাবারের পুঁটলি।

গণপতি বলল, "আমার সঙ্গে শিউজী আছে"—

"শিউজী !" একটি মেয়ে এগিয়ে এল, দেখল তাকিয়ে।

মেয়েটি দেখতে ভালো। কালো পাথরে খোদাই-করা মূর্তির মতো। চঞ্চল চোখ, অনাবৃত পেট, চেলিতে বাঁধা বুক। শান্তার সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে মেয়েটির। চানা চিবোন বন্ধ করে গণপতি আর এক দফা শিউজীর আবির্ভাব-কাহিনীটা ব্যক্ত করল।

মেয়েটি হেসে উঠল, "ওমা, এযে আজব গল্প !"

গণপতি বিরক্ত হল, "দেবতাদের গল্প অমনি হয়।"

লোকগুলো হাসল।

গণপতি বলল, "শিউজীর ভোগের জন্য কিছু দেবে না তোমরা ?

একজন বলল, "না বাবা, আমাদের ভোগের জন্যই শিউজীর কাছে রোজ মাথা খুঁড়ি। তাছাড়া দেবতাদের তো খিদে তেষ্টা নেই আমাদের মতো।"

গণপতি চটে গেল, "হ্যাঁ, সব জেনে বসে আছ আর কি —সবাই পণ্ডিত"—

লোকটি বলল, "পণ্ডিত নই, তবে তোমাদের মতো পণ্ডিতদের বিষয়ে সব জেনে ফেলেছি।"

সবাই হেসে উঠল।

আর একজন বলল, "তার চেয়ে নিজের পেটের কথা বললেই তো ভালো কাকা—শিউজীর নামে দোহাই পাড়ো কেন ?"

গণপতি জবাব খুঁজে পায় না, শুধু মনে মনে বিড় বিড় করে, "নাস্তিক—পাষণ্ডের দল"—

দ্বিতীয় লোকটি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, "আচ্ছা বাবা, এতে তোমার খুব চলে ? তাই না ?"

মেয়েটি বলল, "চলে বৈকি। কাজ না করে দিব্যি চলে যায় বলেই তো শিউজীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের মত ইঁট পাথর ভাঙতে হত তো বুঝত"—

অসহ্য। আবার হয়তো রাগ হয়ে যাবে তার। আবার হয়তো মারামারি লেগে যাবে। না, তার চেয়ে সরে পড়াই ভালো। তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল খেয়ে সে আবার বাঁকটা কাঁধে নিয়ে উঠে পড়লো।

কুলিদের মধ্যে যে সবচেয়ে কমবয়সী, সেই ছোকরা মুখে

হাত লাগিয়ে আঙুল নেড়ে, চেঁচাল, "হর হর মহাদেও কী-ই-ই—জয়"—

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল।

পুকুরের ধার দিয়ে গলিটা গেছে একটা বস্তিতে। বেশ বড় বস্তি।

গণপতি বসল একটা বাড়ীর পাশে, তার চালের ছায়ায়। বাড়ীটার ভেতর থেকে ঝিরঝিরে হাওয়ায় ফ্যান ভাতের গন্ধ ভেসে আসে। খিদেয় পেটের ভেতর মুচড়ে ওঠে গণপতির। এক মুঠো চানা তো এক বছরের বাচ্চার খাবার। তার পেটের আগুন তাতে নিভবে কেন?

এদিকটা নির্জন। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়ায় কেমন অদ্ভুত একটা প্রশান্তি। একটা ভিজে গরম গরম অনুভূতি। আর সেই সেদ্ধ ভাতের সৌরভটা। বাতাসের মধ্যে ঘর-গিরস্তির রোমাঞ্চকর বার্তা। গণপতির মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। তার জীবনটা কেমন যেন ভেঙেচুরে গেছে। মনে সুখ নেই। শিবের পূজারী সে, তবু তার ভাগ্য এমন হল কেন? দীর্ঘশ্বাস ফেলে গণপতি ভাবে যে একটা বিড়ি পেলে বেশ হত। এক পয়সার কিনেবে নাকি সে?

"হুঁ হুঁ—

গণপতি চমকে তাকাল পেছনে—একটি বছর চারেকের কালো প্যান্ট পরা ছেলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শব্দ করছে। সে তাকাতেই ছেলেটি থামল। গণপতি হাসল ছেলেটি রোগা হলেও ভারী সুন্দর দেখতে তো।

" কি বাবা, কি চাই?"

ছেলেটি মাথা নাড়ল, "উহু"—তারপর উবু হয়ে বসল সে। বলল, "এই বাড়ীটা আমাদের।"

গণপতি হাসল, "বটে! তা খুব ভালো বাড়ী।"

ছেলেটি তার ঝুড়ির দিকে তাকালে, "তোমার ঐ ঝুড়িতে কী আছে? সাপ?"

"না বাবা—শিউজী।"

"শিউজী! দেখি—"

ছেলেটি কাছে এগিয়ে এল। দু-চোখ ভরা জ্বলজ্বলে কৌতূহল মেলে সে তেল-সিঁদুর মাখানো পাথরটাকে দেখে বলল, "শিউজী! খুব ভারী ঠাকুর, তাই না?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"কিন্তু ওর মুখ নেই যে?"

"আছে। ভক্তি থাকলেই দেখতে পাওয়া যায় বাবা।" নিজের কথা শুনে নিজেই খুশি হয় গণপতি। বেশ সুন্দর কথা বলেছে সে।

ছেলেটি মাথা নাড়ল, প্রশ্ন করল, "শিউজীর গোঁফ আছে?"

গণপতি হাসল, "তা—তা আছে বৈকি।"

ছেলেটি হেসে বলল, "আমার বাবারো গোঁফ আছে।"

"বটে!"

ছেলেটি মাথা নাড়ল।

গণপতি বলল, "তোমার বাবা বাড়িতে আছে?"

"না। কাজে গেছে। বাড়িতে মা আছে, ভাত রাঁধছে।"

ভাত! বাতাসে তার গন্ধ বইছে। প্রাণ মাতানো সুবাসের মতো।

গণপতি বলল, "যাও, শিউজীর জন্য কিছু ভোগ নিয়ে এস—কেমন ?"

ছেলেটি মাথা নাড়ল, "মা যদি না দেয় ?"

"দেবে দেবে, যাও চেয়ে আনো।"

"আচ্ছা আনছি।"

ছেলেটি ভেতরে চলে গেল।

গণপতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বেশ সুন্দর ছেলেটি। শান্তা থাকলে তারও হয়তো—না, শান্তার কথা আর ভাববে না সে। পাপিষ্ঠা, চরিত্রহীনা, কুলটা সে। কিন্তু আর কি সংসার পাতা যায় না ? এমনি একটা বস্তিতে কি সুখ-দুঃখের মালা ঘুরিয়ে জীবন কাটানো যায় না ? কেরোসিনের ডিবের আলোতে কাজলমাখা দুটি চোখের ওপর চোখ রেখে এলোমেলো পাগলামো কথা কি আর বলতে পারবে না সে ?

"না না—ভিক্ষেটিক্ষে মিলবে না—যাও বাবা এখান থেকে" —ছেলেটি ফিরে এসেছে। সাথে তার মা। গণপতি ঘুরে তাকাল।

মেয়েলোকটি বলল, "রাস্তা দেখো বাবা, এখানে কিছু" —বলেই সে মাঝপথে থেমে গেল।

গণপতিও উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে। দু-চোখ রগড়াতে ইচ্ছে হল তার। চোখের সামনে যেন অন্তহীন কুয়াশা পুঞ্জে পুঞ্জে জমা হয়ে গেল। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। তারপরেই আবার ফিরে এল সব। টিন আর টালির সেই বাড়িটার দরজার পাশে সেই স্ত্রীলোকটি। সেই প্রিয়দর্শন ছেলেটি।

বিষণ্ণ হেসে গণপতি বলল, "শান্তা !"

শান্তা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "গুল্‌জারি শেঠের দোকানে যা তো বাবা"—

"কেন মা ?"

"দু-পয়সার বিস্কুট কিনে খাগে।"

"বিস্কুট !" ছেলেটির দু-চোখে লালসা আর খুশি উপ্‌চে পড়ল, হাসিতে মুখ ভরে গেল। আঁচল খুলে শান্তা দুটো পয়সা দিতেই সে পাছা চাপড়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

শান্তা ঘুরে দাঁড়াল।

অনেক বদলেছে শান্তা। একটু রোগা হয়েছে, বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে। আগের মতো তার শাড়ী জামা পরার মধ্যে সেই ছিম্‌ছাম্ ভাব আর নেই। চোখের তলাটা বসে আছে আর গায়ের রংটা কেমন যেন পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে।

"তুমি অনেক বদলেছ শান্তা।"

শান্তা ঠোঁট বেঁকাল, "সবাই বদলায়, সব কিছু বদলায় জগতে।"

গণপতি মাথা নাড়ল। কেমন যেন কথা আসছে না মাথায়। এই নাটকীয় মূহূর্তটা কতদিন ধরে সে মনে মনে প্রার্থনা করেছে। তার মারাঠী রক্তে প্রতিহিংসার কত রক্তাক্ত ছবি হানা দিয়েছে। কিন্তু আজ—

সে প্রশ্ন করল, "তোমার ছেলে ওটি ? তাই না—"

"হ্যাঁ।"

"সুন্দর দেখতে।" আচ্ছা "ওর বাবা কোথায় ?"

"কাজে গেছে। কাপড়ের কলে কাজ করে—"

দুজনেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। কেমন এক বাধ-বাধ ভাব। যেন প্রথম দেখা হয়েছে। যেন লুকিয়ে লোক-চোখের আড়ালে তাদের এ এক অবৈধ দেখা?"

গণপতি একটু কেশে বলল "তাহলে সুখেই আছ?"

শান্তা তার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি মেলে তাকাল, "সে খবরে তোমার দরকার কী? সুখে না থাকলে বুঝি তুমি সুখী হবে?"

গণপতির দু-চোখে না চাইতেও জল এল, মাথা নেড়ে মৃদু হেসে সে বলল, "না—না—তা নয়—কিন্তু আমার ওখানে তোমার সখ আহ্লাদ—"

শান্তা তাকে কথা শেষ করতে দিল না, জিজ্ঞেস করল, "বুঝেছি; কিন্তু তুমি এখানে এসে হাজির হলে কেন? কি মতলবটা তোমার?"

গণপতি এক পা পিছিয়ে গেল, মাথা নেড়ে বলল, "কোন উদ্দেশ্য নেই শান্তা। শিউজার ইচ্ছে সব। পাঁচ বছর ধরে তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম—একবার জানতে চেয়েছিলাম কেন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে এসেছিলে—তাই হয়তো শিউজা আজ—"

শান্তার দু-চোখে হিংস্রতা ঘনাল, "শিউজা এখনো তোমার ঘাড় থেকে নামেনি দেখছি। তোমার কিছুতেই হুঁশ হল না! অপদার্থ, অক্ষম কোথাকার। তোমাকে দেখলেও দিন খারাপ যায়—"

"শান্তা!"

"যাও, সরে পড়ো এখান থেকে—অনেক কষ্টে নতুন করে জীবন গড়েছি আমি, তার আশেপাশে তুমি আর এস না—"

গণপতি আর্তকণ্ঠে বলল, "যাচ্ছি—যাচ্ছি শান্তা।"

বাঁকটা কাঁধে তুলে গণপতি অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে এগোল।

শান্তা ডাকল, "শোন—"

"কি বলছ শান্তা?" গণপতি তাকাল।

শান্তা করুণ ভাবে হাসল, "বিয়ে-থা করনি আর?"

গণপতিও হাসল, "করলে নতুন বৌটাও পালিয়ে যাবে।"

শান্তা গম্ভীর হল, "যাবেই তো তোমার ঐ শিবঠাকুরকে কেউ সহ্য করতে পারবে না।"

গণপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শান্তার চেহারা বদলেছে; বয়স হয়েছে কিন্তু তবু যেন দাম বেড়েছে। বর্ষার পাহাড়ী ঝরণা এখন হেমন্তের নদী হয়েছে। দেহে-মনে হাহাকারের ঝড় বয়ে যায় গণপতির।

সে বলল, "আমাকে দেখে কি ভয় পেয়েছ শান্তা?"

"ভয়! কেন?"

"হাজার হোক আমিই তোমার মন্তর পড়া সোয়ামী—যদি পুলিশে যাই?"

"যাও না। কিন্তু ঘরে নিয়ে গিয়েও তো বিশ্বাস করতে পারবে না। তোমার ঘরে থাকলেও আমার মালিক আমিই থাকব, ইচ্ছেমতো চলব ফিরব—সহ্য করতে পারবে?"

গণপতি ঝাপসা চোখে মাথা নাড়ল, "না শান্তা। তা পারব না।"

শান্তা হঠাৎ কাছে এগিয়ে এল, গলা নামিয়ে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থের মত বলল, "কী চাও তুমি? জোর করে পেতে চাও আমাকে? এমন অপদার্থ তুমি! এমনি অমানুষ যে আমার সুখটুকুও সহ্য করতে পারছ না!"

গণপতি আবার মাথা নাড়ল, "ভয় করো না শান্তা, রাগ করো না, আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি—"

আবার পা বাড়াল সে।

আবার শান্তা ডাকল, "শোন—"

"কি ?"

শান্তা তার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকাল, মৃদুকণ্ঠে বলল, "পারতো রোজগারপাতি করে ঘরসংসার করো—"

"কেন শান্তা ?"

"কেন আবার ? সুখ চাও না, শান্তি চাও না ? যাও এবার আর জ্বালিও না আমায়—আর, আর এ গলিতে কোনদিন এস না—" ছুটে, প্রায় দৌড়ে ভেতরে চলে গেল শান্তা।

বাতাসে এবার পোড়া ভাতের দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। গণপতি গলিটা বেয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল।

আশ্চর্য। কেন দেখা হল ? শান্তা ? মজা পুকুরের মধ্যে হঠাৎ নদীর জল এসে মিশল কেন ? এবার কি হবে ? আরো আশ্চর্য যে সে রাগল না, শান্তাকে মারতে পারল না, তার চুলের ঝুঁটি ধরে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে পুলিশের কাছে দাঁড়াতে পারল না। আর পারবেও না সে। জোর করে তো মেয়েমানুষকে পাওয়া যায় না।

গলিটা এঁকে বেঁকে গেছে। কোন্ দিকে কে জানে। যাক যেদিকে ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে।

অনেকক্ষণ ঘুরল সে। এলোমেলো। ভূতগ্রস্তের মতো। একদিকে তেলসিঁদুর মাখানো শিবঠাকুর আর পচে-আসা

ফুলপাতা, অন্যদিকে তার নিঃসঙ্গ একক জীবনের ছেঁড়া ছেঁড়া সঞ্চয়। তারও বোঝা কম নয়। সেই বোঝাটা বয়ে বয়ে বেলা গেল, বিকেল হল। কাঁধের ওপর বাঁকটা, ছেঁড়া কাপড়ের পট্টি কেটে, মাংস কেটে যেন হাড় ছুঁতে চাইল তবু হাঁটতে লাগল সে। ঘামে তার কপালের লাল চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক ধুয়ে মুছে এল, তবু চলতে লাগল সে। রাস্তা দিয়ে ভিড় ছুটেছে স্টেশনের দিকে। বাস, ট্রাম, কোলাহল। ছুটছে, সবাই ছুটছে। সন্ধ্যার আকাশে বাদুড়েরা উড়ে যায়। রাস্তায়, রাস্তায় কমাবসানের বাতি জ্বলে। বাড়ি চলো, বাড়ি চলো। পায়ের শব্দে ট্রামের ঘণ্টায়, মোটরের হর্নে ঐ একই ঘোষণা—কাজ শেষ, বাড়ি চলো।

কিন্তু গণপতি কোথায় যাবে? কোন্ দরজার কড়া নাড়বে সে?

মিলের ফটক খোলা। কাতারে কাতারে লোক বেরিয়ে আসছে। ছুটছে বাড়ির দিকে। তাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগে গণপতির চলতে কষ্ট হয়।

"এই, দেখে চলো"—লোকেরা ধমকায় তাকে।

"শিউজী আছেন বাবা—রাগ করো না"—

হ্যাঃ—শিউজীর আর তো কাজ নেই, তোমার ঘাড়ে, চড়ে তিনি ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন"

দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে তবু এগিয়ে চলে গণপতি।

শেষে রাস্তার একপাশে, মস্ত বড় এক গাছের তলায় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে গণপতি। রাত হয় তবু ঘুম আসে না তার। গাড়ী থামলেও ইঞ্জিন বন্ধ হয় নি। তার শরীরের মধ্যে এক

অস্থির উন্মাদনা। বসে বসে রাত কাটায় সে। এখন আর খিদে নেই, তেষ্টা নেই, কষ্ট নেই। শুধু কি যেন চাই, কি যেন চাই।

ভোর হয়। আবার হাঁটা শুরু হয়। কে যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। চলতে চলতে চারদিকে তাকায় গণপতি। পৃথিবী অস্থির। অস্থির জনতা। ছুটছে, সবাই ছুটছে। চলো চলো কাজে চলো। কেউ কারও দিকে তাকায় না, তাকালেও থামে না। মিল ফ্যাক্টরীর সিংহদরজা দিয়ে পিল পিল করে লোক ভেতরে যাচ্ছে। কাজ করো, কাজ করো। শহরের সমস্ত নাস্তিক আর অধার্মিকেরা এ কোন্ সাধনা করছে? অসহ্য। কাঁধের বোঝা আর বওয়া যায় না। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তবু থামা যায় না কেন?

চমক ভাঙল সেই কালকের পুকুরটার ধারে এসে আবার কেন ফিরে এল সে? তার মন তার কান ধরে কেন এখানে নিয়ে এল?

দূরে সেই অট্টালিকা উঠছে। কুলিরা কাজে ব্যস্ত ইঁট ভাঙছে, জল ঢালছে, চুন-সুরকি মেশাচ্ছে, বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে ইঁট আর মশলা নিয়ে ওপরে উঠছে। আর মেয়েরা। চক্ চক্ করছে তাদের গা, কাজের ছন্দে তালে তালে দুলছে তারা, দুলছে তাদের সর্বাঙ্গ। সমস্ত শরীরটা যেন কেঁপে ওঠে দেখতে দেখতে, একটা অস্থির উত্তপ্ত উত্তেজনায় দু-চোখ জ্বালা করে।

"ওটা কি ঠাকুর— সাধুবাবা?"

গণপতি তাকাল। একটা আট নয় বছরের ছেলে। তারপর তাকাল তার ঝুড়ির দিকে। হেসে বলল সে, "শিউজী—তুমি নেবে?"

"আমি? দেখি।"

ঝুড়ির ভেতর থেকে দামোদরের স্বপ্নে-পাওয়া সেই কালো, মসৃণ গোল পাথরটাকে তুলে নিল গণপতি। নির্বিকার মুখে তুলে দিল ছেলেটার হাতে।

"ইস—কী বিশ্রী তেল সিঁদুর মাখানো! ঠাকুর কোথায়? এযে পাথর গো সাধুবাবা!"

গণপতি তার ছেঁড়া জামা কাপড়গুলো তুলে নিয়ে বাঁকটাকে একপাশে ফেলে দিয়ে হাসল, বলল, "ঠিকই বলেছ বাবা—পাথর ওটা। খেলবার পাথর—"

বড় বড় পা ফেলে সে সেই কর্মব্যস্ত মজুরদের দিকে এগিয়ে গল।

ছেলেটা তাকাল পাথরটার দিকে, তারপর নিজের মনে বলল, "শালা পাথরটাকে গছিয়ে গেল—দূর, এত্ত বড় পাথর নিয়ে কে খেলবে বাবা?"

এক টান মেরে সে পুকুরের নিস্তরঙ্গ জলে পাথরটাকে ছুঁড়ে ফেলল। টুপ করে শব্দ হল একটা। মজা পুকুরে একটু মরা ঢেউ উঠে মিলিয়ে গেল।

অট্টালিকা উঠছে। আকাশকে ছোঁবে বলে।

গণপতি গিয়ে দাঁড়াল সেখানে। তার দু-চোখ জ্বলতে থাকে। সে তাকায় চারদিকে। ব্যস্ত, কাজের নেশায় আচ্ছন্ন সবাই। তার মনে নেশা জেগেছে। হ্যাঁ, সেও কাজ

করবে। যে কোন কাজ। কাজ পেলেই সেই বস্তিটার একপ্রান্তে একটা ছোট্ট ঘর নেবে সে। আর দিনে দু'বার করে সেই টিন আর টালির তৈরি বাড়িটির পাশ দিয়ে কাজ করতে যাবে। যাবার সময় আর ফেরবার সময় দু'বার করে সে তার পালিয়ে-যাওয়া বৌকে এক ঝলক করে দেখবে। দেখবে আর দিন গুনবে।

হ্যাট মাথায় দেওয়া একজন লোকের কাছে গিয়ে গণপতি সেলাম করে দাঁড়াল, হাসিমুখে বলল, "একটা কাজ চাই হুজুর —যে কোন কাজ।"

জীবিকা

খোট্ কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কেন কাঠ কেটেছিলি ?

সুখন চুপ করে রইল।

দহিসর গাঁয়ের খোট্ মানে জমিদার শ্রীহোমি সেট্‌নার ফরসা রঙ ক্রমে লাল হয়ে উঠতে লাগল। বাপের মত চালাক নয় সে; কিন্তু বাপ মারা যেতেই বম্বে শহর থেকে গাঁয়ে উঠে এসে সে প্রজাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে,বাপের চেয়েও ডাকসাইটে লোক সে। তার বুদ্ধি নেই কিন্তু রাগ আছে। সে রাগ আগুনের মত, দহন না করে শেষ হয় না।

আধ বিঘে জমির ধান অনেক দিন আগেই খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল সুখন। নিজে সে শক্তসমর্থ, কালো পাথরের মত জোয়ান লোক, বউ তুলসী আর এক বছরের বাচ্চাটা —এই তিন জনের দু মাসের খরচা জুগিয়ে আধ বিঘে জমির ভাণ্ডারটি নিঃশেষ হয়ে গেলেই সুখন আর তুলসী পাহাড়ের

জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটে। সেই কাঠ নিয়ে বেচে সমুদ্রের তীরঘেঁষা আগাশি'র গঞ্জে। কোন মতে দু-বেলা নুনভাত খেয়ে, কখনও বা এক বেলা খেয়ে বছরটা ঘুরে যায়, পাকা ধানেভরা আধ বিঘে জমির ফসলে গিয়ে আবার দু মাসের জন্য হাঁপ ছেড়ে বাঁচে তারা। কিন্তু গতবার অতিবৃষ্টিতে ফসল খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে ধারকর্জ হয়েছিল খুব। ফলে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাঠ কেটেও সামাল দিতে পারছে না সুখন। তার ওপর অসুখ-বিসুখ যাচ্ছে এবার। তুলসী ম্যালেরিয়াতে ভুগছে, বাচ্চাটা এখনও জ্বরে আর পেটের অসুখে ভুগছে। দিন কয়েক আগে সেও জ্বরে পড়েছিল। গতকাল ভাত খেয়ে পাহাড়ের জঙ্গলে যাওয়ার মত শক্তি ছিল না তার, তাই খোটের পাহাড়ে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। কাঠ কেটে ফেরার পথে খোটের লোকেরা দেখে ফেলেছিল। ফলে আজ ভোরবেলাতেই তলব পড়েছে।

খোট্ গর্জন ক'রে উঠল, "শালা হারামী, জবাব দিচ্ছিস না যে—অ্যাই রাস্কেল"—

সুখন আমতা আমতা করে বলল, "আজ্ঞে, শরীরে জোর পাচ্ছিলাম না, তাই"—

"তাই !" খোটের মুখ ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠল, "তাই তোর বাপের জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলি—কেমন ? শা—লা—তোর ইয়ে—

অকথ্য একটা গাল দিয়েও তৃপ্ত হ'ল না খোট্, হঠাৎ নাল-লাগানো বুটপরা এক পা তুলে সজোরে সুখনকে লাথি মারল সে "বল্ শালা—আর কখনও চুরি ক'রে কাঠ কাটবি ?—বল্।"

লাথি খেয়ে টালটা সামলে নিল সুখন, কিন্তু কিছু বলল না। শুধু নাকটা ফুলে উঠল তার, চোখের তারায় চকমকির ক্ষণদীপ্তি ঝলসাল।

কিন্তু সামলাতে না সামলাতেই খোট্ আবার পা তুলল, আর মুহূর্তের মধ্যে সংযমের ছিলেটা ছিঁড়ে গেল সুখনের। সোজা হয়ে এক পা পেছিয়ে গিয়ে সে বলল, "খবরদার হুজুর, আর মারবেন না।"

কি! একটা নগণ্য ওরলি প্রজার সাহস দেখে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল খোট্, তারপরেই লাফিয়ে এগিয়ে গেল সুখনের দিকে। এলোপাথাড়ি লাথি মারতে মারতে বলতে লাগল, "খবরদার'—বটে! এতবড় সাহস তোর! শা—লা—আমি তোর—"

যে তাগিদে কুকুরও কামড়ায়, লাথি খেতে খেতে সেই তাগিদে সুখনও হঠাৎ এবার মরিয়ার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল খোটের ওপর। কিসের খোট্—সে কি কোন দেবতা!

"খবরদার—"

অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তর-কঠিন দুঃসাহসের আঘাতে খোট্ ধরাশায়ী হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে খোটের পার্শ্বচর অনন্তরাও আর তহশীলদার লাফিরে পড়ল সুখনের ওপর।

খোট্ চেঁচাল, "মেরে ফেল—মেরে ফেল শালাকে—"

কিন্তু মরল না সুখন। আধমরা অবস্থার ওকে ওরা জনবিরল একটা পাহাড়ের পাগ্‌দণ্ডীর ওপর ফেলে রেখে গেল। সেখানেই পড়ে রইল সে। অনেকক্ষণ। শিশু আর অশ্বত্থ-গাছের ডালপালা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে রোদ এসে পড়ল

তার ওপর। গাছের ডালে কয়েকটা কাক কিছুক্ষণ কা-কা করল, কয়েকটা কাঠবেড়ালি এসে তার গায়ের কালশিরা আর রক্তের দিকে মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে তাকাল, তারপর পালিয়ে গেল। জড়পিণ্ডের মত, লালরঙের হিজিবিজি-আঁকা কালো পাথরের চাংড়ার মত অনেকক্ষণ পড়ে রইল সুখন। ক্রমে তার প্রহার-জর্জর ফাটা চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে রক্ত শুকিয়ে গেল, কালশিরার দাগগুলো দাগড় দাগড়া হয়ে ফুলে উঠল। মৃতপ্রায় সাপের মত ধীরে ধীরে মৃতসঞ্জীবনীরসে-ভরা বাতাস টেনে টেনে সুখনের চৈতন্য ফিরে এল। বেদনা ও যন্ত্রণার এক গাঢ় অনুভূতির ভেতর থেকে যেন সে নিজের জীবনকে দেখতে পেল। জীবনে সব চেয়ে বড় সত্য যেন এই বেদনাটাই, সারাজীবনের সমস্ত সুখ-সঞ্চয়ও যেন তার কাছে নগণ্য মনে হ'ল। ধীরে ধীরে সেই বেদনার অনুভূতিকেও ভোতা করে দিয়ে খিদের অনুভূতিটা যখন বড় হয়ে উঠল, তখন সুখন কষ্টেসৃষ্টে পা বাড়াল।

পাহাড়ী একটা ঝরণা থেকে গায়ের রক্ত ধুয়ে মুছে সে বাড়ি ফিরে দেখল যে, তুলসী নেই। আধভাঙা আটচালাটার বারান্দায় সে অনেকক্ষণ ধরে বসে রইল। বসে বসে খিদের প্রার্থনাকে শুনতে লাগল সে। গোঁয়ার একটা ইঁদুরের মত সেই খিদে যেন তার নাড়িভুঁড়ি ধরে টানছে, ঝাঁকাচ্ছে। দুপুর পড়ে এসেছে, পাখির ডাকে-ভরা দাহসর গাঁয়ের অলস ঐন্দ্রজালিক মুহূর্তগুলো সুখনের ক্ষুৎ-বেদনার তীক্ষ্মমুখে পড়ে খান খান হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ বউ ফিরে এল।

তুলসীর কোলে বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে। তুলসীর চোখের নীচেটা ফোলা, বোধ হয় খুব কেঁদেছে।

ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল তুলসী, স্বামীর সমস্ত চেহারাটা তন্ন তন্ন করে যেন দেখে নিল, তারপর তালা খুলে ভেতরে ঢুকল।

সুখন বলল, "খেতে দে—"

বাচ্চাকে শুইয়ে রেখে স্বামীকে খেতে দিল তুলসী। খেতে খেতে সুখন জিজ্ঞেসা করল, "কোথায় গিয়েছিলি ?"

তোকে খুঁজতে।

"মুলগা (বাচ্চা) কেমন আছে ?"

"একই রকম। আজ জ্বর আরও বেড়েছে।"

"হুঁ।"

ভাত; জল, নুন আর লঙ্কা—বুটজুতোর নালে কেটে যাওয়া দেহের ওপর যেন মলমের কাজ করল। তুলসী বলল, "খুব লেগেছিল নাকি এ্যা ?"

সুখন একবার কটমট করে তাকাল, তারপর বলল, "সে খবরে তোর দরকার কি ? মরি নি তো।" তারপর ধীরে ধীরে স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাল চলবে তুলসী ?"

"না।"

একটু চুপ থেকে তুলসী মৃদুকণ্ঠে বলল, "কিন্তু এই মুলগাটার ওষুধ—বড় নেতিয়ে পড়েছে দুদিন ধরে—"

"আগাশিতে নিয়ে যাবি ?"

"টাকা ?"

"হুঁ, তা হ'লে বৈদের ওষুধই চালা।"

সন্ধ্যের অকন্ধারে গঙ্গুয়া, পিত্‌লে আর রঙ্গনেকর এল। নিঃশব্দে ওরা ওদের সহানুভূতি জানাল, তারপর বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল। কিই বা বলার আছে। অবস্থা সবার সমান। দোর্দণ্ডপ্রতাপ খোটের বিরুদ্ধে সুখন যে হাত তুলেছিল এইটুকুই সান্ত্বনা।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গুয়ারা চলে গেল। বাড়ির পেছনকার জঙ্গলে শেয়ালেরা মাঝে মাঝে হুল্লোড় করতে লাগল। রাতে খেল না কেউ। ঘরে তেল কম, তাই পিদিমটা নিবিয়ে দু জনে চুপ করে বসে রইল। মাঝে মাঝে বাচ্চাটা ককিয়ে ওঠে, তুলসী মাই খাওয়ায় তাকে। চুকচুক করে কয়েকট টান দিয়েই বাচ্চাটা আবার ঝিমিয়ে পড়ে।

তুলসী বলল, "বাচ্চাটার গতিক ভাল লাগছে না আমার।"

সুখন বলল, "রাতটা কাটুক।"

পোকামাকড়ের সরসর শব্দ শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি, ঝিঁঝিপোকার ডাক আর শেয়ালের চিৎকারের মাঝে রাত গভীর হতে লাগল। শেষে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। অনেকক্ষণ পরে, ঘুমের ঘোরে সুখনের মনে হ'ল যেন শরীরের কালশিরাগুলোতে।কে সেঁক দিচ্ছে।—কে?

চোখ মেলল সে। প্রথমটা মনে হ'ল স্বপ্ন, তার পরেই লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল, "তুলসী!"

কি "কি হয়েছে? তুলসী চমকে চোখ মেলল।"

চারদিকে আগুন। দক্ষিণের বাতাসে লকলক করছে আগুনের শিখা, চটপট শব্দে বাঁশ ফাটছে, তিক্তমধুর একটা গন্ধ বাতাসে।

ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে ওদের নিয়ে বেরোল সুখন। তারপর হাতের কাছে যা পেল তা টেনে বের করল। কয়েকটা ছেঁড়া কাপড় জামা, কয়েকটা হাঁড়ি বাসন, ছুরি আর কুড়ুলটা ছাড়া বাকি সব জঞ্জালের ঐশ্বর্যকে লেলিহান অগ্নিশিখা নিজের লোল রসনা দিয়ে লেহন করে নিল।

যখন গঙ্গুয়ারা এল তখন সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পাতলা ছাই হাওয়ায় উড়ছে ফাগের মত। তুলসীর কোলে বাচ্চাটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, আর পাথরের মত স্থির হয়ে বসে আছে সুখন।

গঙ্গুয়া বিড়বিড় করে বলল, "খোট্ শালা পেছনে লেগেছে—"

গঙ্গুয়ার বাড়িতেই জায়গা পেল ওরা। রোদ উঠতেই গঙ্গুয়া গেল শেঠ বিঠলদাসের কাঠগুদামে কাজ করতে। সুখন গেল বৈদ্যের কাছে।

বৈদ্য বলল, "ব্যাটার বুদ্ধি দেখ, ম্যালেরিয়া জ্বর চলেছে তার জন্যে আবার ভাবনা! যে বড়ি দিয়েছি, তাই খাওয়াগে। আমার পয়সা?"

"দেব দু-এক দিনে বৈদজী—"

বৈদ্য অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল, "কচু দেবে।"

তারপর কাঠ কাটতে বেরোল সুখন। শরীর এখনো বেদনায় চুর-চুর, তবু যেতেই হবে। চলতে চলতে অবাক লাগে তার। রাতারাতি সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল! বাপ-পিতামহের ভিটে বাড়ি! সূচিমুখ একটা বেদনা মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে।

ওদিকে বিঠলদাসের দোকানে অনন্তরাও আরও দুজন সঙ্গী নিয়ে এসে গঙ্গুয়াকে স্পষ্ট শাসিয়ে দিল ঃ "খবরদার, ওই শালা সুখনকে আজই তাড়াবি—"

গঙ্গুয়া প্রতিবাদ জানাল, "কিন্তু রাওজী, ওর বাচ্চাটা—"

"বাচ্চা চুলোয় যাক। তোকে যা বললাম তা মনে রাখিস ব্যাটা—খোটের ওপর লাফিয়ে পড়ে, শালার এত বড় সাহস! ওকে যে খুন করি নি, এই ওর বাপের ভাগ্যি। সাবধান গঙ্গুয়া, ওকে জায়গা দিস নে—

সেখান থেকে অনন্তরাও সঙ্গীদের নিয়ে বেরোল সুখনের খোঁজে। শিকারী ডালকুত্তার মত ঠিক গন্ধ শুঁকে শুঁকে বের করল তাকে। তখন সবে একটা শুকনো ডাল কেটে নামিয়েছে সুখন। খোটের জঙ্গলের বাইরের জঙ্গল।

অনন্তরাও হাতের লাঠিটা ঠুকে বলল, "কার হুকুমে কাঠ কাটছিস রে শালা?"

জী! সুখন বোকা হয়ে গেল ঃ "জী, এটা তো খোটের নয়।"

"খোটের নয়! তা হ'লে তোর বাপের বুঝি?"

রাওদের সঙ্গীরা হেসে উঠল।

অনন্তরাও বলল, "সরে পড়্, এখানে নয়।"

ঝগড়ার কোন অর্থ হয় না। অনন্তরাওয়ের মানুষ খুন করা একটা বিলাসিতা। সেই বিলাসিতার জোরেই সে খোটের পার্শ্বচর। সুখন পাহাড় থেকে নেমে গেল।

কিন্তু অন্য পাহাড়ে গিয়েও সেই একই দশা হ'ল। অনন্তরাও যেন প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সুখনকে কাঠ কাটতে দেবে না। সেখানেও সে এসে হাজির হ'ল।

শেষ পর্যন্ত আর কাঠ কাটা হ'ল না। নিষ্ঠুর ডালকুত্তার মত, নাছোড়বান্দা রাহুর মত পেছনে লেগে রইল অনন্তরাও। তারপর যখন ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় সে গঙ্গুয়ার বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল তখন হঠাৎ পেছন থেকে হুম করে এক লাথি বসাল রাও। মুখ থুবড়ে মাটির প্রলেপ লাগানো কালো পাথরের ওপর পড়ে গেল সুখন, নাক দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করল। মুহূর্তের জন্য হাতের কুড়ুলটা যেন ক্ষেপে উঠল, তার পরেই নিজেকে ছেড়ে দিল সে।

তার পিঠের ওপর পা রেখে রাও বলল,"তুই একটা মাছির চেয়েও অধম সুখন, তোর বাঈও এমন কিছু দেখতে নয় যে তোকে খুন করি। কিন্তু তবু বলছি, কাল দিনের বেলা যদি গাঁয়ে দেখি তো এই পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে তোকে এক শো টুকরো করে ছড়িয়ে দেব—"

গঙ্গুয়া শুনল এবং শোনাল। তারপর দুই বন্ধুই চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ বাদে গঙ্গুয়া বলল, "মুম্বই চলে যা কাল।"

সুখন মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "অত্ত বড় শহর, কাউকে চিনি না, তা ছাড়া হাতে পয়সা নেই—"

তা কি করবি, খোটের রাগ পড়ুক, শেষে একদিন এসে মাপ চাইলেই হবে। আমরাও ধরব তাঁকে।"

সুখন হ্যাঁ-না বলল না শুধু আওড়াল: কিন্তু মুম্বই গিয়ে খাব কি? ছেলেটার অসুখ—"

"মুম্বইতে ডাক্তার আছে—হাসপাতাল—"

"হুঁ। কিন্তু খাব কি গঙ্গুয়া? খাব কি?"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গঙ্গুয়া বলল, "তা হ'লে একটা কাজ করবি ? বেআইনী ?"

"কি ?"

এবার নীচু গলায় গঙ্গুয়া বলল, "দু তোলা আফিং নিয়ে" যা শহরে, তোকে ঠিকানা দিয়ে দেবে, সেখানে পৌঁছে দি ই পনেরো-কুড়ি টাকা লাভ হয়ে যাবে—তা দিয়ে দিন পনেরো কাটিয়ে দিবি, আর ততদিনে একটা চাকরি খুঁজে নিবি কোথাও।"

আফিং ! সুখন ভয় পেল।

গঙ্গুয়া বলল, "অনেকেই ও-কাজ করছে, খাজনা দিয়ে ব্যবসা করতে গেলে লাভ কম থাকে বলে এইসব করে সবাই। আগাশি গাঁয়ে এর আড্ডা।"

কিন্তু পুলিশ ?

তোকে দেখে কেউ সন্দেহ করবে না, শুধু শহরে ঢোকবার মুখের 'চেকনাকা'টা সাবধানে পার হবি।

"কিন্তু গঙ্গুয়া—"

"তা ছাড়া আর উপায় নেই সুখন, আমার তো ধার দেবার মত টাকা নেই।"

চুপ করে রইল সুখন। মনটা সায় দিচ্ছে না।

হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল তুলসী। বাচ্চাটা অজ্ঞানের মত হয়ে আছে। ওরা গিয়ে দেখল। মাথায় জল ঢালল। অনেকক্ষণ বাদে একটু জ্বর কমলো, বাচ্চাটা ক্ষীণকণ্ঠে একবার কেঁদে উঠে চারদিকে নজর বুলিয়ে মাকে আঁকড়ে ধরল। বাইরে এসে সুখন বলল, "আফিংয়ের ব্যবস্থাটাই করে দে গঙ্গুয়া, আর তো পারছি না।"

তখুনি বেরুল দুজনে। মহাজন বিঠলদাসের সঙ্গে গিয়ে দেখা করল গঙ্গুয়া, অনেকক্ষণ কি সব ফিসফিস করে বলল, তারপর সুখনকে ডাক দিল।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকাল বিঠলদাস, বলল, "সাবধানে যেতে পারবি তো রে ব্যাটা?"

"জী, যাব।"

"জামিন কি রাখবি?"

"জামিন?"

"জমি জামিন রাখ্, বিনাপয়সায় তো আর তোকে এক শো টাকার আফিং কেউ দেবে না।"

শেষ পর্যন্ত তাই করতে হ'ল। রীতিমত টিপসই দিয়ে লিখে দিতে হ'ল যে, এক শো টাকার জন্য নরশুর ছেলে সুখন তার আধ বিঘে জমি বন্ধক রেখে গেল। এক মাসের মধ্যে এক শো টাকা ফেরত না দিলে জমির মালিক হবে শ্রীবিঠলদাস নল্লেকার।

বিঠলদাস একটা চিঠি দিল গঙ্গুয়াকে। সেই চিঠি নিয়ে সেই রাতেই গাঁয়ের শেষপ্রান্তে ইব্রাহিম মিঞার সঙ্গে দেখা করল সুখন ও গঙ্গুয়া।

ইব্রাহিম বলল, "বস্, আধ ঘণ্টা বাদে আসছি—"

আধ ঘণ্টা বাদে কাগজে মুড়ে এক মুঠো আফিং এনে দিল ইব্রাহিম মিঞা, বলল, হুঁশিয়ার, জিনিস তো এতটুকু, কিন্তু ধরা পড়লে দু বছর জেলে পচবি। আর কে দিয়েছে, কোথায় পেয়েছিস বলে দিলে—। "গলার ওপর হাতটা বুলিয়ে ইব্রাহিম মিঞা কথাটা মুখে না বলেও স্পষ্ট করে দিল।

আফিং নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরল। তুলসী এ সব কথা কিছু জানতে পেল না। মেয়েছেলেকে সব কথা বলে লাভ কি? শুধু ভয় পাবে।

ভোরবেলায় বাচ্চার অসুখটা আরও বাড়ল।

শহর প্রায় আঠারো মাইল দূরে। পাহাড়ী পথ অনেকটা।

অন্ততঃ আট ঘণ্টার রাস্তা। এই দীর্ঘ পথ এই অসুস্থ বাচ্চাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তুলসী একবার বলল, "তু দিন বাদে চল।"

সুখন উভয়-সঙ্কটে পড়ল।

কিন্তু একটু ফরসা হতেই অনন্তরাও এসে হাঁক পাড়ল, "গঙ্গুয়া!" ডাক শুনে গঙ্গুয়া শিউরে উঠল, ফিসফিস করে বলল"আর দেরি করিস না সুখন, বাইরে দুশমন দাঁড়িয়ে, শহরেই তোর ছেলেকে হাসপাতালে দেখাস. তা ছাড়া জন্মমৃত্যুর মালিক ভগবান তো আছেন।"

রাওয়ের অসহিষ্ণু ডাক আবার শোনা গেল, "এই শালা গঙ্গুয়া!"

তখুনি রওয়ানা দিল সুখন। আর উপায় নেই।

পেছন থেকে অনন্তরাও চেঁচিয়ে বলল, "যখন মরবার হবে তখনি এ গাঁয়ে ফিরে আসিস, তার আগে নয়।"

লেজ গুটিয়ে কুকুরের মতই নিঃশব্দে এগিয়ে চলল সুখন, পেছন ফিরে আর তাকাল না।

আগে সুখন। মাথায় বাসনকোসন, কাপড়ের বড় পোঁটলা বগলে আরও খুঁটিনাটি দরকারী একটা জিনিসের ছোট পুঁটলি আর এক হাতে কুড়লটা। পেছনে রুগ্ন ছেলেটাকে ঢেকে কোলে নিয়ে তুলসী। পাহাড়ী পথ। আঁকাবাঁকা। চড়াই উৎরাই।

বাপ-ঠাকুরদার দহিসর গ্রাম পেছনে মিলিয়ে গেল। একবার পেছন ফিরে তাকাল সুখন, তারপর তুলসীর দিকে। মূহূর্তের জন্য। দুজনেই দুজনের মনের কথা টের পেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার নিঃশব্দে চলতে লাগল।

পায়ে পায়ে সেকেণ্ড কাটে, মিনিট কাটে, ঘণ্টা কাটে। একটা পাহাড়ের ঢালু থেকে আর একটা পাহাড়ে ওঠা। পশ্চিমঘাটের পোড়া পাথরের পাহাড়। তলার দিকে মাটি আছে, আছে সবুজ বন। ঘাস লতা আগাছা ঠেলে নুড়ি-মেশানো রাস্তার বন্ধুরতাকে অবহেলা করে ওরা এগিয়ে চলে। শিশু আম আর তাল-গাছ আসে, আসে নানা জানা-অজানা গাছের সমারোহ। সেখানে পাখি ডাকে নানা জাতের। কিন্তু সেদিকে কান যায় না ওদের। চেতনাতে এখন একটি লক্ষ্য—শহর মুম্বই।

পাহাড়ের মাঝখানে থেকে বড় বড় গাছের ছায়া আর পাওয়া যায় না। তখন ছোট ছোট গাছ আর আগাছার জঙ্গল। তারপর নিরেট কালো পাথর। বৈশাখ মাসের রোদে লোহার তাওয়ার মত গরম হয়ে উঠতে থাকে সেই পাথর। ঘাম শুরু হয়, গা ভিজে যায়, জামা ভিজে যায়। শেষে বাচ্চাটাও ক্ষীণকণ্ঠে অস্বস্তি জানাল।

তুলসী থমকে দাঁড়াল, বলল, “জলতেষ্টা পেয়েছে।”

সুখন না তাকিয়ে বলল, "এখানে জল কোথায়? এগিয়ে চল্।"

তুলসী আর কথা বলল না, শুধু জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে আবার চলতে লাগল।

ধাপে ধাপে বেলা বাড়ে। ওরা পাহাড়ের সিঁড়ি ভাঙে। আকাশের সিঁড়ি ভেঙে সূর্য মাথার ওপরে ওঠে। বাচ্চাটা আবার নিঝুমের মত হয়ে পড়ে। তুলসী সামনের দিকে ঝুঁকে নিজের ছায়া দিয়ে ছেলেকে ঢেকে নিয়ে চলে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ছেলেটা, ছেলেটার উত্তাপে তুলসীরও গা যেন জ্বলতে থাকে।

হঠাৎ একটা ঝরণা পাওয়া গেল। বৈশাখের কড়া রোদে ঝরণাটা সরু একটা ধারায় টিপ টিপ ক'রে পড়ছে। সেই জল গেলাসে ধরে এনে নিজে খেয়ে তুলসীকেও খাওয়াল সুখন। জলের সঙ্গে একটা করে সেঁকা রুটি আর গুড়।

তুলসী বলল, "বাচ্ছাটা কেমন যেন—"

"কেমন কি?"—সুখন তাকাল।

বড় জ্বর।

"এগিয়ে চল্।" শহরের হাসপাতালে দেখাব, সেরে যাবে—

আবার এগিয়ে চলা! মাথার মধ্যে পাথরের মত জমাট অনেক স্মৃতি। সামনে অস্পষ্ট ভবিষ্যৎ।

রোদ কড়া হয়। পাথর গরম হয়। চলা যায় না। চড়াই আর উৎরাইয়ের দুর্গমতা পায়ের পেশীগুলোকে অবশ করে আনে। চিলের ডাকের তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে শুনতে, উদ্ভিদ-লতা গাছপালা ও মাটির উত্তপ্ত ও বিচিত্র এক উত্তেজক গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ভারের চোটে বাঁকা হয়ে চলতে লাগল ওরা।

অনেকক্ষণ ধরে। শেষে ওদের পায়ের পেশী ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে উঠল, হাঁটু যেন অবশ হয়ে এল।

তুলসী বলল, "আর পারছি না।"

"এগিয়ে চল্ তুলসী।"

"নোকো।"

"এগিয়ে চল্।"—নির্দয়কণ্ঠে বলল সুখন।

কিন্তু তুলসী একটা গাছের তলায় বসেই পড়ল। সুখন থামল।

সে তাকাল বউয়ের দিকে। তুলসীর বুক দ্রুত ওঠানামা করছে। জোর জোরে হাঁপাচ্ছে সে। মাথার ঘামটা মুছে ফেলে সুখন অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

"শহর আর কত দূর?"—তুলসী প্রশ্ন করল।

"আর দু-তিন ক্রোশ—নিম্‌চি, সিরহোল, তারপরেই শহরের এলাকা—"

বাচ্চাটার দিকে তাকাল তুলসী, বলল, "মুলগাটার গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।"

সুখন ধীরে ধীরে বলল, "শহরে হাসপাতাল আছে—বড় বড় ডাক্তার—"

ক্ষীণকণ্ঠে, যেন বাপকে সমর্থন করার জন্যই বাচ্চাটা একটু কান্নার শব্দ করল, তার বড় বড় দুটো চোখ মেলে একবার তাকাল।

"মুলা—মাজা মুলা—চুঃ—।" আদর করে ডাকল তুলসী।

তবু কাঁদতে লাগল বাচ্চাটা। একটা কাক গাছের ওপর থেকে মাথা বেঁকিয়ে এক চোখে তাদের দেখে কর্কশকণ্ঠে ডেকে উঠল।

"দুধ দে।" সুখন বলল।

তুলসী বলল, "দুধ নেই।"

"দেখ্ না।"

তুলসী বুকের আঁচল সরিয়ে গোলিটা টেনে তুলে একটা মাই বের ক'রে ছেলের মুখে গুঁজে দিল।

তবু ছেলেটা কাঁদতে লাগল। সুখন তাকাল।

তুলসী বলল, "দুধ নেই—আমার বুক শুকিয়ে গেছে।"

শুকনো স্তন। রসের ভাণ্ডার নিঃশেষিত। শিরাগুলো পর্যন্ত দেখা যায়। তবু মাইয়ের বোঁটা ধরে টিপে টিপে দেখতে লাগল তুলসী, কিন্তু এক ফোঁটাও দুধ বেরুল না।

চাপা কান্নার সুরে তুলসী বলল, "দুধ নেই, আমার শরীর শুকিয়ে গেছে।"

সুখন উঠে দাঁড়াল, বলল, "এবার চল্।"

ছেলেটা ক্ষীণকণ্ঠে আরও কয়েক মিনিট কেঁদে শেষে চুপ করল।

ওরা আবার চলতে লাগল।

এবার কিছুটা সমতল ভূমি। তৃণদগ্ধ ধূ-ধূ মাঠ। আঁকা বাঁকা আলের পথ। দূরে একপাল মোষ, একটা ছোট্ট গাঁয়ের আভাস। মাটি থেকে উত্তাপের হালকা শিখা ওপরে উঠছে, অতি-সূক্ষ্ম তারের মত কাঁপছে। মধ্যাহ্নের রৌদ্ররাগ। সূর্য মাথার উপরে উঠে এবার পশ্চিমে হেলেছে। এগিয়ে চল্। মাঠ পার হয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে এগিয়ে চল্। পথের শেষপ্রান্তে শহর। সেখানে নতুন জীবনের শুরু হবে।

এক ক্রোশ—দু ক্রোশ পথ শেষ হয়।

ঝিম ঝিম করে মাথা। পাহাড়ের গা বেয়ে চলতে চলতে হাঁটু ভেঙে ভেঙে আসে, মনে হয় গড়িয়ে পড়ে যাবে।] পায়ের চাপে ছোট ছোট নুড়ি গড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে। চারদিক থেকে একটা ঝম্‌ঝম শব্দ উঠতে থাকে। সে শব্দ মাটির, আকাশের, তাদের শিরা উপশিরার। ঝম্‌—ঝম্‌—ঝ—ম্‌-ম্‌—

তুলসী থামল: "আর পারছি না।"

"এগিয়ে চল্‌।"

"আর পারব না—"

এই পাহাড়ের পরেই তো শহর-সীমানা—"

বাধ্য হয়ে পা বাড়াল তুলসী। কষ্টে তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁতে চেপে স্বামীর অনুসরণ করতে লাগল সে।

পাহাড়ে মাথা বেয়ে ওপিঠে নামল তরা, হঠাৎ থামল। ওই তো! পাহাড়ের নীচে দিয়ে পিচ-বাঁধানো সড়ক চলে গেছে। সেখানে একটা ছোট্ট তাঁবু আর চারজন পুলিশ।

"পুলিশ! দাঁড়া তুলসী।—সুখন থামল্‌।"

"আর পারছি না।"

সুখন বলল, "পৌঁছে গেছি, ওই শহরের বড় রাস্তা।"

তুলসীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "তা হ'লে চল্‌।"

"দাঁড়া, ওখানে পুলিশ।"

"তাতে কি?"

"গাঁয়ের লোকদের ওরা অনেক সময় ধরে।"

"ওঃ, তা হ'লে কি হবে?"

"চল্‌, ওই পাহাড়টা ঘুরে যাই।"

তুলসী আর্তকণ্ঠে মাথা ঝাঁকাল, "না না, আমি মরে যাব।"

"কিন্তু উপায় নেই তুলসী।"

"নোকো, আমি একটু জিরোব, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।"

তুলসী বসল। সুখন বাধ্য হয়ে বসল, কিন্তু তার নজর রইল তাঁবুটার দিকে।

তুলসী বাচ্চাটার দিকে তাকাল।

মাজা পোরো—চুঃ—। "ছেলের গায়ে হাত দিয়ে সে বলল, ওর জ্বর ছেড়ে গেছে জী।"

"অ্যাঁ?"

"শরীর ঠাণ্ডা।"

"তা হ'লে তো ভালই, শহরের হাওয়া লাগতেই—"

"কিন্তু বড় বেশী ঠাণ্ডা যে!"—তুলসীর গলা কেঁপে উঠল, সে ছেলের গায়ে হাত দিল, বুকে হাত দিল, "এ জী!"

"কি হ'ল?"

"নড়ছে না মাজা মুলা—নিশ্বাস পড়ছে না।"

এক লাফে কাছে এগিয়ে এল সুখন। ছেলেকে ছুঁয়ে, ভাল ক'রে দেখে তুলসীর দিকে স্থিরদৃষ্টি মেলে বলল, "মূলা মরে গেছে।"

আর্তকণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠল তুলসী, "না।"

সুখন ধমকাল, "চুপ, নীচে পুলিশ।"

"নোকো—নোকো—না।"

"চুপ।" নিষ্ঠুর ভঙ্গীতে দুলে উঠল সুখন: "কেঁদে কি ছেলে ফেরত পাবি? চুপ।"

স্বামীর চোখে কঠিন একটা হিংস্রতা। সেই হিংস্রতা তুলসীকে মূক করে দিল।

তবু সে বিড়বিড় করে বলল, "হয়ত মরেনি, জ্বর করেছে বলেই—"

সুখন বলল, "মরে গেছে।"

বহুদূর থেকে একটা ট্রেনের শব্দ ভেসে এল। তাদের চারদিকে এই সবাক পৃথিবীটা প্রজাপতির পক্ষচ্ছন্দে, শালিকের ডাকে, ভ্রমরের গুনগুনানিতে, নানা পাখির কূজনে আর গাছের মর্মরে এক বিচিত্র মনোমোহিনী সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করতে লাগল। কিন্তু ওদের কোনদিকে খেয়াল রইল না। পাহাড়ের চূড়োকে শ্মশান করে মরা ছেলে কোলে করে বসে রইল মা, আর বাপ পুলিসের তাঁবুর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে চেষ্টা করেও বার বার খেই হারাতে লাগল।

হঠাৎ এক সময়ে উঠে দাঁড়াল সুখন, হাত বাড়িয়ে বলল, "দে, মূলাকে কবর দিয়ে আসি।"

মরা ছেলে বুকে চেপে ধরে তুলসী বিকৃতকণ্ঠে বলল, "নোকো, নো-কো।"

"দে তুলসী, কাঁদিস না।"

"না—না—না—"

জোর করে ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিল সুখন, নির্মম ভঙ্গীতে বলল, "খবরদার, কাঁদিস না, নীচে পুলিস।"

ছেলেকে নিয়ে সে টলতে টলতে তুলসীর চোখের আড়ালে গেল।

তুলসী কেমন যেন হয়ে গেল। তার সমস্ত অনুভূতি তালগোল পাকিয়ে গেছে। পাহাড়ের চূড়োয় বসে জীবন-মৃত্যুর দুর্বোধ্য প্রহেলিকায় তাকে যেন অভিভূত করে দিল।

কিন্তু একটু বাদেই সুখন ফিরে এল। মরা-ছেলে কোলে

নিয়েই।

তুলসী তাকাল।

সুখন মুখ নীচু ক'রে ধরা গলায় বলল, "পারলাম না, শহরের সীমানায় ঢুকে তারপর কবর দেব। ওর—ওরও তো শহরে যাবার কথা ছিল।"

"তবে তাই চল্।" তুলসী দু হাত বাড়াল ছেলে কোলে নেবার জন্যে।

সুখন বলল, "না, এবার একটু আমার কোলে থাক্, তুই এই পোঁটলাটা নে।"

"তারপর ?"

"শহরে চল্।"

পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এল তারা। আর উদ্যম নেই, শক্তি নেই, উৎসাহ নেই। বিকেল হয়ে গেছে। রোদের রং বদলে গেছে—আকাশে নরম স্বপ্নের মত মেঘের মিছিল।

তাঁবুর ধারে পৌঁছোতেই একজন পুলিস ডাকল, এই কাকা, ইধর আও।"

"জী !" তাদের সামনে দাঁড়াল সুখন।

"কোথায় যাবি ?"

"মুম্বই।"

"পোঁটলা খোল্।"

হাতের বেটন দিয়ে পোঁটলার জিনিষগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ সুখনের দিকে তাকাল পুলিসটা, ভুঁরু কুঁচকে বলল, "অমন ভাবে চেয়ে আছিস কেন রে ব্যাটা—অ্যাঁ, কি হয়েছে ?"

সুখন বলল, আমার ছেলে মারা গেছে।

"কোন ছেলে ?"

"এই যে।"

"এই !"—পুলিসটা চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল, "ব্যাটা পাগল নাকি, মরা ছেলে কোলে কোথায় যাচ্ছিস ?"

"জী ওরও শহরে যাবার কথা ছিল কিনা, তাই।"

অন্য পুলিসগুলো এসে ভিড় করে দেখল তাকে। সুখন একটা নতুন ঘটনা।

প্রথম পুলিসটা বলল, "শোকে মাথা খারাপ করে লাভ কি কাকা ! যা যা, ছেলেকে কবর দেগে ?"

তাড়াতাড়ি তার পোঁটলা দেখে, কোমর পকেট টিপে দেখে স্বামী-স্ত্রীকে ছেড়ে দিল পুলিসগুলো। তাদের চোখে সহানুভূতি।

ধীরে ধীরে রাস্তা ধরে এগোতে লাগল ওরা। মুম্বইয়ের পিচ-বাঁধানো অভিজাত পথ। কিন্তু এ দিকটা শহর-সীমান্ত তাই নির্জন।

কিছুদূর এগিয়ে একটা বড় বাগান ডান হাতে। সুখন বলল, "এখানে একটু ব'স্ তুলসী ?"

"কেন ?"

"মূলাকে এবার কবর দিই, ও তো শহরে এবার পৌঁচেছে শুধু হাসপাতালেই নিয়ে যাওয়া হল না !"

তুলসী বসে পড়ল। মৃদুকণ্ঠে বলল, "আর একবার আমার কোলে দে ?"

"না, মরা জিনিসের জন্য পাগল হতে নেই তুলসী।"

"ওরে, তুই বড় নিষ্ঠুর।"

"কাঁদিস না তুলসী, কাঁদিস না—"

বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল সুখন। তুলসীর দৃষ্টিসীমার বাইরে। নিবিড় ঝোপের নিভৃত গোপন ছায়ায় গিয়ে থামল সে। এই উপযুক্ত জায়গা। এখানে পাখি ডাকবে, ফুল ফুটবে। এখানেই পাখির মত, ফুলের মত একটি শিশু মিশে থাকবে। মাটি হয়ে, সুর হয়ে, আলো আর অন্ধকার হয়ে। তার কচি দেহের মৃদু সুবাস ফুলের সৌরভের মত বাতাসে ভাসবে। এখানেই।

বাচ্চাকে মাটিতে রেখে পকেট থেকে ছুরিটা বের করে একবার সে শিউরে উঠল, তারপর মাটি খুঁড়তে লাগল। দ্রুত। তাড়াতাড়ি। মাটি খুঁড়তে গিয়ে তার পাথরের মত শরীরের ভেতরেও যেন খুঁড়ছে সে, যেন জল খুঁজছে। জীবনের প্রতীক যে জল।

হঠাৎ একটা ক্ষীণ কান্নার শব্দ ভেসে এল। সুখন চমকাল। না, বাচ্চাটা নয়। তুলসী কাঁদছে। বিচিত্র একটা খেয়ালের তানের মত। গানের বিলাপের মত। কাঁদুক তুলসী।

মাটি খুঁড়ে ছুরিটার দিকে তাকাল সুখন, হঠাৎ হাতটা কাঁপল, ছুরিটা কাঁপল, টান মেরে ছুরিটাকে সে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। বাতাস কেটে আহত একটা সাপের মত শ্‌ শ্‌ শব্দে ছুরিটা উড়ে গিয়ে চোখের আড়ালে পড়ল। তারপর ছেলেকে সন্তর্পণে তুলে সেই গর্তের মধ্যে শোওয়াল সুখন, শুইয়ে তার গায়ের ওপরকার ছেঁড়া কাপড়টা তুলল। ছেলেটার পেট অনাবৃত হল। সেখানে চৌকো করে কাটা একটা দাগ, দাগের মুখে জমানো জলীয় রক্তের ধারা। শরীরটা টান টান করে দাঁতে দাঁত চেপে সেই কাটা দাগের এক পাশ ধরে টান দিল সুখন। মাংস উঠে এল। ছেলের পেটের ভেতর থেকে

কাগজে মোড়া আফিংয়ের ডেলাটা টেনে বের করে চোখ বুজে আবার পেটটা ঢেকে দিল সে। তারপর এক হাতে ছেলের ওপর মাটি ঠেলতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ সে কেঁপে উঠল। অদৃশ্য এক ভূমিকম্পের দোলায় যেন একটা কালো শিলাখণ্ড নড়ে উঠল। তার কান্না পেতে লাগল, কান্নার চেয়েও গভীর ও মর্মান্তিক একটা অনুভূতির তীক্ষ্ণতা বুকের মধ্যে বার বার বিঁধতে লাগল। শেষবারের মত মাটিটা ঠেলে দিয়ে সে উপলব্ধি করল যে, এই আশ্চর্য সুন্দর পৃথিবীতে এবারকার দুর্লভ মানব-জন্মলাভের জন্য ওই এক বছরের অবোধ ছেলেটা তার পিতৃঋণ শোধ করেই মরেছে।

দুর্দিন

"অমা, দাদা যাবে না বলছে—এ—"

চেঁচিয়ে মাকে জানাল মাধুরী।

"চুপ কর রাক্কুসী—শাকচুন্নী কোথাকার—যা ভাগ্" —পানু একটা ধাক্কা মারল মাধুরীকে। দু'চক্ষে সে ওটাকে দেখতে পারে না—বোন না শত্তুর। আঠারো বছরের ধিঙ্গি ছুড়ি, অথচ একটু দয়ামায়া নেই, চার বছরের বড় দাদার জন্য এতটুকুও সম্ভ্রমবোধ নেই! যেমন বিচ্ছিরী দেখতে তেমনি বিচ্ছিরী ওর ব্যবহার, আর মুখতো নয় যেন আঁশবঁটি। ওর মেছুনী হলেই মানাত।

ধাক্কা খেয়ে মাধুরী চীৎকার করে উঠল, 'অ'মা গো-ও-ও—আমায় মেরে ফেল-লোও-ও-ও—"

চীৎকার শুনে ছোটবোন বুধু ছুটে এল, ছোটভাই ভানু ছুটে এল।

সবশেষে ছুটে এল বাবা আর মা। মাধুরী যদি আর

একটু জোরে চেঁচাত তাহলে বোধ হয় মনসাতলা বাইলেনের বাকী সব বাসিন্দারাও ছুটে আসত।

"কি—হয়েছে কি? অত চেঁচাচ্ছিস কেন?" প্রভাবতী জিজ্ঞেস করল।

"দেখনা বাবা—দাদাকে র‍্যাশন আনবার কথা বলতে আমার ওপর খেঁকিয়ে উঠল, আমায় ধাক্কা মেরে রাক্কুসী শাকচুন্নী কত কি বলতে শুরু করল"—

বুধু খিলখিল করে হেসে উঠল।

"এ্যাই—চুপ্"—ব্রজেশ্বর গর্জন করল, তারপর ব্রহ্মের মত নির্গুণ তার বড়ছেলের দিকে তাকাল। সবাই ঘরে আসার পর পান্নু কাঁথামুড়ি দিয়ে শুধু উঠে বসেছিল, সবার দিকে কট্‌মট্ করে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল সে।

"এ্যাই শুয়ার—ওঠ্—ওঠ্ বলছি"—ব্রজেশ্বর আবার গর্জাল।

কাঁথাটা গা থেকে ফেলে পান্নু উঠে দাঁড়াল। সোজা দেয়ালের কাছে গিয়ে একপাশে হেলে-পড়া ব্রাকেট থেকে তার বহুপুরোনো ষ্ট্রাইপ-সার্টটা টেনে নিয়ে হাত গলাল।

ব্রজেশ্বর তার সকালবেলার নিত্যকৃত্য শুরু করল, "জ্বালিয়ে খেল শুয়ার—বাইশ বছরের ধেড়ে ছেলে, কোন কাজেরই যুগ্যি হল না! দেশ গেল, সম্পদ গেল এই বুড়ো বয়েসে দেড়শ' টাকা রোজগার করতে রক্ত জল হয়ে গেল—তবু শুয়ারটার হুঁশ হয় না। এত্তবড় ছেলে দেখলে মানুষের বুক ফুলে ওঠে অথচ আমার ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়! হতভাগা ষাঁড়ের গোবর, ইষ্টুপিড—না করল একটু লেখাপড়া, না শিখল কোন কাজ—দু'দিন বাদে মরেও যে আমি শান্তি পাব

না—ওর হাতের পিণ্ডি গিলেও আমার সদগতি হবে না”—

ছিট্‌কে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পান্নু, রান্নাঘরের পাশে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বলল, “টাকা আর কার্ড কই-ই-ই-ই—”

প্রভাবতী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ব্রজেশ্বর বিছানায় বসে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল। মনসাতলা বাইলেনের নীচের তলার এই ছুটো খুপরীর মত ঘর আর ভিজে স্যাঁতসেঁতে খোলা বারান্দায় রান্না করতে হয় তাদের। অন্ধকার, দুর্গন্ধ এই লেনটার মত তাদের জীবন—আলো-বাতাসহীন, আশ্বাসহীন। দেড়শ টাকায় কোনমতে মৃত্যুকে এড়ানো যায় কিন্তু ভালোভাবে বাঁচার কোন আশ্বাস পাওয়া যায় না। দেশে যা কিছু ছিল তা এক ঐতিহাসিক ঘটনার চাপে তার নাম থেকে মুছে গেছে। বড় ছেলেটা গুণ্ডামী করে চিরমূর্খ রয়ে গেল, বড় মেয়েটা রাতের ঘুম হরণ করছে—তারপর আছে বুধু, ভানু। ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার—

প্রভাবতী টাকা আর র‍্যাশন কার্ড দিল ছেলের হাতে, বলল, “তোর কি হয়েছে বলত—এই—”

পান্নু মুখ বিকৃত করে বলল, “ভূতে ধরেছে।”

“শোন কথা ছেলের—এইভাবে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হয়!”—

“উঠতে বসতে ঝ্যাঁটা মারলে বলতেই হয়—”

পান্নু থলি ছুটোকে একটানে তুলে নিয়ে গলিতে বেরিয়ে গেল।

প্রভাবতী স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে, বিড়বিড়

করে বলল, "কি যে করি ওকে নিয়ে—কি যে হবে ওর—"

একটা বেড়ালের বাচ্চা সামনে পড়ল। কষে একটা লাথি মারল তাকে পানু। শা—লা। মাধুরীটা হতচ্ছাড়ী, দেব আজ ওর কান ছিঁড়ে। উঠতে বসতে বকবে সবাই, যেন বাড়ির চাকর! সা—লা—। কেন, কি দোষ করেছে সে? লেখাপড়া হয়নি তো কি করবে সে? কতদিন সে বলেছে একটা মাষ্টার রেখে দিতে—দিয়েছে? টেবুটা কি করে পাশ করল? দুটো মাষ্টার দু' বেলা পড়াত তাকে—সে তো শুধু একটা চেয়েছিল। গরীব? বোঝে সে। তাহলে আর তাকে দোষ দিয়ে হবে কি? বাজারে যা, তেল আন্ লঙ্কা আন্, হাসপাতাল যা, ডাক্তারের কাছে যা—দিনরাত হুকুম করলে কি লেখাপড়া হয়? লেখাপড়া যে একটা সাধনা তা তার জানা আছে। আসলে দুঃখু আছে বাবা মার—বেশী বক্‌লে ঝক্‌লে যাবে একদিন সে শিকলি কেটে। বাপ-মা হয়েছে তো মাথা কিনেছে নাকি? সা—লা—

গলির শেষে মাধব চ্যাটার্জি রোড—সেটা গিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে। সেই মোড়ে র‍্যাশনের দোকান। পানু গিয়ে কিউতে দাঁড়াল। আজ শনিবার, ভীড়টা বেশী—অজগরের মত এঁকে বেঁকে গেছে কিউটা। দেরী হবে বেশ।

পানু একটা বিড়ি বের করে ধরাল।

অজগরের মত কিউটা অজগর হয়েই রইল। অবশ্য পানু ধীরে ধীরে ল্যাজ থেকে পেটে, পেট থেকে গলায়, গলা থেকে মুখে গিয়ে পৌঁছোল এক সময়ে। কার্ড আর টাকা দিয়ে সে রসিদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সামনের

দিকে তাকাতে ঘড়ির ওপর নজর পড়ল—ইস্, সাড়ে ন'টা। 'জগন্নাথ কেবিনে' চায়ের আড্ডাটা এতক্ষণ তাকে ছাড়াই খুব জমে গেছে।

অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল, "সা—লা—"

ছোক্‌রা কেরাণী কটমট করে তাকাল, "কি বলছেন?"

একগাল হাসল পান্নু, "বেলা দেখে বলছি দাদা—আপিসের টাইম যে হয়ে এলো—"

পাঁচসিকে পয়সা ফেরৎ পাওয়া গেল। সিকিটা ট্যাঁকে গুঁজে টাকাটা পকেটে রাখল পান্নু, তারপর থলি দুটো তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

মনসাতলা বাই লেন আর মাধব চ্যাটার্জী রোডের মোড়ের বাড়ীটার রং লাল। রক্তের মত লাল আর দামী। সেই বাড়ীর নীচের তলায় থাকেন কৃপানাথবাবু—কোথায় কোন্ আপিসের বড়বাবু। তাঁর একমাত্র মেয়ে, নাম পারুল। পারুল নামটা যে ভারী মিষ্টি, একথা পান্নু চার-পাঁচ মাস আগেও জানত না। এ অঞ্চলের আর কেউ হয়ত তার মত ভাবে না যে, পারুলের মত মেয়ে এক যুগে একটা জন্মায়।

পারুলের সঙ্গে মাধুরীর ভাব আছে। কিন্তু বড়বাবুর মেয়ে পারুল মনসাতলা বাই লেনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যায় না—মাধুরীই আসে এ-বাড়ী। মাধুরীর সঙ্গে যেদিন ঝগড়া হয়না, সেদিন সে-ও মাধুরীর সঙ্গে পারুলদের বাড়ী আসে। পারুলের ছোটভাই রাতুল স্কুলে পড়ে—পাড়ার মধ্যে পান্নুর প্রতাপ এবং খ্যাতির পরিমাণ কতটুকু, তা সে জানে, দিদির কাছেও তা বলেছে। পারুল ওরা বেশ খাতির করে তাকে। শুধু বাড়ীতেই—সা—লা—।

পান্নুর এখনো মনে আছে সেদিনকার কথা। এই তো পাঁচ মাস আগেকার কথা। বসন্ত কালের সন্ধ্যায় তখন গলির মধ্যে সবে ল্যাম্পটা জ্বলেছে, কয়লার ধোঁয়ায় মেশানো আলো তখন এক রহস্য-কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে, দিনের বেলাকার নোংরা, অন্ধকার মনসাতলা বাইলেন তখন যেন পরীরাজ্যের কোন গলি হয়ে উঠেছে। ঠিক তেমনি সময় পারুলকে দরজার গোড়ায় দাঁড়ানো দেখেছিল সে, পারুল চানাচুর কিনছিল। আহা, সে কী রূপ! ল্যাম্পের আলো এসে পড়েছিল তার মুখের ওপর। বিকেলের যত্নার্চিত সাজ তার পরনে, ফর্সা রংয়ের ওপর পাউডারের মৃদু প্রলেপ। হাল্কা নীল রংয়ের পাৎলা শাড়ীর বন্ধনে মোড়া তার উদ্ধত যৌবন—মাইরি, সে কী চেহারা! ঠিক যেন নার্গিস—

পান্নু থমকে দাঁড়ালো গলির মুখে।

পারুলদের জানালার গোড়া থেকে কে যেন সরে গেল। পারুল নাকি! বিপরীত দিকে তাকাল সে। রামহরিবাবুর বারান্দাতে বসে একটি সুবেশ ফুলমার্কা ছোক্‌রা একটা বই পড়ছে। খুব মন দিয়ে পড়ছে—যেন বেদব্যাস মুনি বেদ পড়ছে। সা—লা—।

ছোক্‌রা তো এ-গলির নয়। কোথায় দেখেছে তাকে?

র‍্যাশন নিয়ে বাড়ীতে ঢুকল পান্নু।

মাধুরী কাছে এল। একেবারে বেহায়া হতভাগী, একটু আগের কথা তার মনে নেই!

“দেখি দাদা, এবারকার চালটা কেমন?”

কাছে এসে দাঁড়াল সে। প্রভাবতীও এল। একটা টাকা ফেরৎ দিল পান্নু।

"আর বাকী চার আনা?" প্রভাবতী সব হিসেব রাখে। একটি পয়সাতেও মনসাতলা বাইলেনে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারে।

পানু মুখখানা করুণ করে বলল, "হারিয়ে গেছে মা"—

"হারিয়ে গেছে!" প্রভাবতী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, "চার আনা পয়সা হারিয়ে ফেললি তুই!"

মাধুরী মুখ বেঁকাল, "মোটেই হারায়নি মা—দাদা মিছে কথা বলছে—"

"মুখপুড়ী—তুই সব সময়ে পেছনে লাগবি?" দুম্‌ করে মাধুরীর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে পানু বাইরে বেরিয়ে গেল।

"নাঃ—বড় বাড় বেড়েছে—জ্বালিয়ে খেল হতভাগা"—

গলির মধ্যে চলতে চলতে মায়ের কথাগুলো শুনতে পেল পানু। বয়ে গেছে—সব কথা কানে তুলতে নেই।

কিন্তু রামহরিবাবুদের বারান্দায় সেই ছোকরা তখনো বেদপাঠে রত।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, "বলি অ' মসাই"—

"এ্যাঁ!" ছোকরা তাকাল তার দিকে, পানুর চওড়া কব্জি আর হৃষ্টপুষ্ট শরীরটাকে আড়চোখে দেখে নিয়ে মুখ ফেরাল সে, বলল, "বলুন"—

"তাহলে পষ্ট করেই বলছি মশাই—এটা ভদ্দরলোকের পাড়া—বুয়েচেন"—

"তার মানে?"

"তার মানে, নিজের বাপের বাড়ীর বারান্দায় বসে অ-আ-ক-খ পড়ুনগে, বুয়েচেন—আপনি যে কিসের পাট পড়তে

এয়েচেন, তা কি বুঝিনামশাই! যান্, কেটে পড়ুন—"

"আপনি গালাগালি করছেন কেন—আপনি কি এ-গলির"—

"হ্যাঁ বাওয়া—আমি এ-গলির জমিদার, আমি এ-গলির রাষ্ট্রপতি—সা-লা, ফের তর্ক করবি তো কেটে ফেলব—পান্নু মজুমদারকে চিনিস না সা—লা"—

"বাঃ—গাল দিচ্ছেন কেন? যাচ্ছি তো"—একটি মেয়েলি ও করুণ ভাব ফুটে উঠল ছোক্‌রার মুখে।

পান্নু বুক ফুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ বাওয়া—যাও—আর কোনদিন যদি এদিকে দেখি তো টের পাবে—লুচ্চামি করার আর জায়গা পাওনি তুমি? পড়ার নামে মেয়েছেলেদের দেখা?"—

ছোকরা দ্রুত পালিয়ে গেল।

সা—লা—প্রেম করতে এয়েচেন! পান্নু মজুমদার যার স্বপ্ন দেখে, সেই মেয়েকে জয় করতে এসেছে। ঐ মেনীমুখো মেয়েলি ছাঁদের ছোক্‌রা!

পারুলদের বাড়ীর দিকে তাকাল পান্নু। জানালার গোড়ায় পারুলের মুখ। ঘুরে সে সেখানে গেল।

"পারুল—"

পারুল দরজা খুলল, পান্নু ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়াল। তাদের ঘরের চেয়ে বেশী ভাল নয় দেখতে পারুলদের ঘর, কিন্তু অদ্ভুত পরিচ্ছন্ন আর অল্পর মধ্যে নিখুঁত সাজানো। এই ঘরে দাঁড়িয়ে পারুলকে দেখলেই কেমন যেন বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে পান্নুর। এ যেন একটা অন্য জগৎ। রাস্তায় চলতে চলতে, চায়ের দোকানে বসে,

মা-বাবার বকুনি খেতে খেতে, নিজেদের নোংরা ঘরের রিক্ততার মধ্যে যে জগৎটার ছবি মাঝে মাঝে জোনাকি-দীপ্তির মত জ্বলে আর নেভে, সেই জগৎটাকে যেন এখানে পুরোপুরি অনির্বাণ পাওয়া যায়।

"গলিতে কার সঙ্গে কথা বলছিলে পানুদা?" পারুল জিজ্ঞেস করল। ওর ঠোঁটের কোণে একটা তির্যক আভাস চোখের তারাটাতে তীক্ষ্ণ একটা জিজ্ঞাসা।

"কার সঙ্গে আবার—কানাই—ও-পাড়ার কানাইটার সঙ্গে"—

"কানাই কে?"

"বদমাস—এক নম্বরের ইয়ে"—

"হুঁ"—

পারুলের দিকে তাকায় পানু। পারুল দাঁড়িয়েই থাকে, পানুকেও সে বসতে বলে না। কেমন যেন লাগে পানুর। রামহরিবাবুর বারান্দায় পাঠরত সেই মেয়েলি ছাঁদের ছোক্‌রার সামনে যে আত্মবিশ্বাস তার ছিল, তা এখন অন্তর্হিত হয়ে গেছে। পারুলকে দেখলেই এমন হয়। কি যেন আছে ওর মুখে। লম্বা, ছিপছিপে গড়ন পারুলের, বয়সে সে মাধুরীর সমানই হবে, কিন্তু বুদ্ধিতে আর কথাবার্তার ভঙ্গীতে ওকে যেন নিজের চেয়েও বড় মনে হয় পানুর। সাদা জমির ওপর কালো ফুলতোলা মাদ্রাজী শাড়ী পরেছে পারুল, চুলগুলো ফেঁপেফুলে রয়েছে মাথায়। ঝকঝকে গায়ের রং পারুলের—কেমন, তার উপমাটা চট করে ভেবে পায়না পানু—সব মিলিয়ে শুধু একটা ছবি মনে পড়ে তার—নার্গিস।

"তোমার এই শাড়ীটা ফাইন পারুল—"

"বাবা দিয়েছেন কাল—"

"হুঁ—চমৎকার—অবশ্য তুমি যা পরো, তাতেই বেশ দেখায়—"

"অনেকবার শুনেছি ওকথা"—পারুল ঠোঁট উল্টিয়ে হাসে আর পান্নুকে দেখতে থাকে।

ওর চোখে কেমন যেন একটা নির্লজ্জ ভাব, পান্নুর অস্বস্তি লাগে।

"এক গেলাস জল দেবে পারুল?"

"এত সকালে তেষ্টা পেল?"

পান্নু হাসবার চেষ্টা করে, "কি জানি—তোমার কাছে এলেই আমার এমনি হয়—মাইরি বলছি"—

পারুল মুখটা বিকৃত করে সরে গেল। পান্নুর হাসি বন্ধ হয়ে গেল। কি হল বাবা!—মেয়েগুলোকে সে বোঝে না—। রাজকাপুর-নার্গিসের ছবিটা আজ দেখতে হবে। একটু শিখে নিতে হবে।

পারুলের ছোটভাই রাতুল জল নিয়ে এল ঘরে।

"জল খাও পান্নুদা—"

"এ্যাঁ!—ওঃ—"

জল যে এমন বিস্বাদ লাগে, তা কি পান্নু আগে জানত! পারুলকে সে বুঝতে পারে না।

"আরো জল চাই?"—পারুলের ভাই রাতুল বলল।

"না"—

পান্নু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাধব চ্যাটার্জি রোড ছাড়িয়ে ডানদিকে—বড় রাস্তার ওপর। 'জগন্নাথ কেবিনে' তখন জমজমাট ব্যাপার। প্রাণের বন্ধু তিলু, ছুটকু, অজিত—তিনজনেই বসে আছে। পানুকে দেখেই বিরহের খাস্তা বুলি বেরোতে লাগল।

"এতক্ষণ বাদে এলি ?—সা—লা"—

"সালা যে উড়ছে আজকাল"—

"সালা রাজকপুর হয়েছে"—

পানু হ্যা-হ্যা করে হাসল,—"আরে চোপ্ সালারা, বেশী ইয়ার্কি করিস্ না"—

তিলু বলল, "সালা বোস্"—

"চা খাওয়া মাইরি"—

"খা সালা—'জগন্নাথ কেবিন' তো আমার বাপের কাছে ধার নিয়েছিল"—

"হ্যাঁরে তিলু, রাজকপুর নার্গিসের নতুন ছবিটা দেখেছিস ?"

" 'আহ্' ?"

"হ্যা"—

"না ভাই—আজ যাব—চল্‌না"—

"যাব"—

অজিত মাথা নাড়ল, "কি হবে হিন্দী ছবি দেখে—চল্ বাংলা ছবি দেখি"—

পানু মুখ বাঁকাল, "থুঃ—সালা কি যে বলিস্। দিনরাত যে হালতের মধ্যে আছি তাই ছবিতে দেখব ? বাপ চোখ রাঙাচ্ছে, আমি র‍্যাশানে দাঁড়িয়ে বিঁড়ি ফুঁকছি—ঘরে বোনের অসুখ—এইসব দেখব নতুন করে ? গুষ্টির পিণ্ডি—

তার চেয়ে 'পাসের বাড়ি', 'শ্বশুর বাড়ি,' 'সালীর বাড়ি,
—এইসব দেখলে তবুও মন্দ লাগে না—"

তিলু মুচকি হেসে বলল, "আর 'পারুলের বাড়ি' ?"

পানু তিলুর পিঠে একটা কিল মারল, "যাঃ সালা—ইয়ার্কি করিস্ না—"

বন্ধুরা হেসে উঠল।

চা এল।

চায়ে চুমুক দিয়ে পানু জিজ্ঞেস করল, "চাকরিবাক্রির কোন খবর পেলি রে তিলু ?"

তিলু বুড়ো আঙ্গুল নাচাল, "লবডঙ্কা—"

"কি করা যায় বল্তো ?"

"কি আবার ?"

"আমার তো এখন শনির দশা চলেছে—কিস্যু হবে না।"

"কে বলেছে ?"

"ঐ মোড়ে যে যতীশ ভট্টাচার্যের জ্যোতিষালয় আছে না ? ঐ বুড়ো—"

"চল, আমিও দেখাব"—

"পাঁচটাকা নেয় সালা বুড়ো—"

"তাহলে তো আর হল না—"

"আরে তোর তো ভালো সময়ই যাচ্ছে—এমন খাসা"—

"এই—রাগাস্ না মাইরি"—পানু হেসে সুড়ুৎ করে এক চুমুক চা গিলল, পরে হাত পাতল অজিতের দিকে, "একটা বিড়ি দে তো—"

অজিত বিড়ি দিল। সেটা ধরিয়ে সজোরে একটা টান দিল পানু রাস্তার দিকে তাকাল। ট্রামবাসের ধারা বয়ে

চলেছে। ব্যস্ত মানুষের মিছিল চলছে একটানা। শব্দ কোলাহলে বিচিত্র, যন্ত্র ও মানুষের দ্বৈত গতিতে কম্পমান মহানগরী। ওদিকে তাকিয়ে কি যেন চায় মনটা। কি যেন—সা—লা—।

"মার—মার—মার—"

একটা কোলাহল উঠল রাস্তার ওদিক থেকে।

"মার—মার—মার—"

তিলু উঠে দাঁড়াল, "কি ব্যাপার রে পানু ?"

"চল্ তো—"

রাস্তায় গিয়ে দেখল যে, একজন পকেটমারকে ধরে মার দিচ্ছে সবাই। ভীড় ঠেলে এগোল চারজনে। বেশ তাগড়া জোয়ান একজন লোক—পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে, বাবু মত চেহারা। চারদিক থেকে লোকেরা কিল-চড় বর্ষণ করছে তার ওপর।

"শালা—পকেটমার—"

তিলু বলল, "মার সালাকে—"

পানু এগিয়ে চটাপট দুটো চাঁটি কষিয়ে দিল লোকটার মাথায়। অদ্ভুত একটা তৃপ্তির শিহরণ খেলে গেল তার শরীরে। সা—লা—।

পুলিশ এল, ভীড় কমে গেল। পকেটমারকে কেন্দ্র করে যে লোকেরা এতক্ষণ হল্লা করছিল, তারা পাঁচ-সাত মিনিট বাদে কর্পূরের মত উড়ে গেল। তারপর আবার সেই ট্রামবাস আর জনতার স্রোত।

"মেরেছি সালাকে কয়েকটা"—পানু হেসে বলল।

চায়ের দোকানে ফিরে চার বন্ধুর পয়সা জড় করে দাম

শোধ হল। তারপর ফুটপাথে গিয়ে একটি দোকানের বাইরে বসে চারজনে কিছুক্ষণ বিড়ি টানল।

উজ্জ্বল, ঝকঝকে দিন। আকাশে সাদা মেঘের মিছিল। বড় বড় বাড়ী, নানা রঙের পোশাক-পরা নরনারী। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কাজ করে। কিন্তু তাদের মত লোকও তো কম নেই। কাজ নেই দেশে—তাদের উপযুক্ত কাজ নেই।

"একটা লণ্ড্রি দিবি পানু ?"—তিলু বলল।

"মন্দ নয় মাইরি—বেড়ে চলে—"

"হাজার খানেক টাকা হলে শুরু করা যায়—"

"টাকা কোথায় পাব ?"

"বিয়ে কর না সালা—তোর শ্বশুর দেবে ?—"

অজিত ফুট কাটল, "মানে পারুলের বাবা—"

পানু কিল মারল তাকে, "মেরে ফেলব সালা—"

ছুটকু বলল, "বেলা হয়েছে মাইরি—চল্ এবার—"

"চল্"—তিলু বলল, "তাহলে আজ বিকেলে সিনেমা দেখবি তো সবাই ?"

"দেখব"—পানু বলল, "রাজকপুর আর নার্গিস—আঃ"—

বাড়ী ফিরতে গিয়ে গলির মধ্যে আবার সেই মেয়েলি ছাঁদের ছোকরাকে দেখতে পায় পানু। মুহূর্তের জন্য। তারপরেই ছোকরা হাওয়া হয়ে গেল গলি থেকে। মনসা-তলা বাই লেনের ভেতর থেকে চাঁদমণি লেনের সরু ফালিটা দিয়ে কোনদিকে যে গেল সা—লা !

ভয় পেয়েছে। পানু মজুমদারকে দেখে ও সারা জীবন ভয় পাবে। আঃ, পকেটমারটাকে কষে দুটো থাপ্পড়

মেরেছে সে, ব্যাটা সারা জীবন মনে রাখবে। পারুল এখন কি করছে ?

আবার বাড়ী।

মাধুরী হাঁক দিল, "মা, দাদা এয়েছে—"

প্রভাবতী বেরিয়ে এল ঘর থেকে, হাত পেতে বলল, "চার আনা পয়সা দে পান্নু, হাতটান চলছে বড়"—

"নেই—"

"দে বাবা—একটা পয়সাও কত কাজে লাগে—"

"হারিয়ে গেছে—"

"হতভাগা—তুই জীবনভোর জ্বালাবি ?"

"নেই পয়সা—হারিয়ে গেলে কি করব ?" পান্নু ঘরে ঢুকে গেল।

মায়ের গজগজানি অগ্রাহ্য করেও চটপট খেয়ে নিল সে, তারপর ছেঁড়া কাঁথাটা টেনে নিয়ে বিছানায় গড়াল।

মায়ের রাগ এক সময় পড়ে এল, মধ্যাহ্নের আলস্য তার হাড়-জিরজিরে শরীরটাকে এক সময়ে অনাবৃত বারান্দাতেই কাৎ করে দিল। মাধুরী ভাঙা চিরুণী দিয়ে মাথার অল্প চুলে পাতাবাহার কেটে হয়ত কোন বান্ধবীর বাড়ী গেল। বুধু পাশের বাড়ীতে। ভানু গেছে কর্পোরেশনের ফ্রি স্কুলে! বাবা আপিসে। শহর কলকাতা ব্যস্ত। কিন্তু মনসাতলা বাইলেনের এই উদ্ব্যস্ত আর উদ্বাস্তুদের জীবনে ব্যস্ততা কোথায় ? অনন্ত, অবয়বহীন ভবিষ্যতের অন্ধকারে সাঁতার কাটতে কাটতে ডুবে যায় সবাই, ভাবতে ভাবতে ভাবনাকে এড়ায়, এড়িয়ে ঢলে পড়ে ঘুমের ঘোরে। কিন্তু ঘুম গাঢ় হয় না, এক সময়ে ভেঙ্গে যায়। তাতেও যন্ত্রণা। দৈহিক অতৃপ্তির

একটা জ্বালাময় অবসাদ নিয়ে সারা জীবনের অতৃপ্তিকে বার বার তুলোধুনো করে আবার দৈনন্দিন জীবনের পুনরাবৃত্তি চলে। মনসাতলা বাই লেনের জীবন একটা যন্ত্রণা। সা—লা—

পানু উঠে দাঁড়াল। সন্ধ্যা বেলায় রাজকাপুর আর নার্গিস। কম করেও একটা টাকা তো চাই। পারুল অনেকটা নার্গিসের মত দেখতে। তিলু বলেছিল যে, নার্গিস মানে ফুল। পারুলও ফুল। সে কি রজনীগন্ধা? একটা টাকা চাই। কি যেন চায় মন? এই রিক্ততা, এই দারিদ্র্য, এই ঘ্যান-ঘ্যানানি, ঝগড়া, বকুনি—সব ছাড়িয়ে—সা—লা—টাকাটা পাব কোথায়? বড় লোকদের বাড়িতে ডাকাতি করলে বেশ হয়। ছিঃ—পকেটমারকে সে না আজ মারল। না না—বাড়ী থেকে এক টাকা নেওয়া যায়। মায়ের টাকা কোথায় আছে?

তোষক ওল্টায় পানু বালিশ ওল্টায়, এখানে ওখানে নিঃশব্দে তস্করের মত সতর্কে দেখে। হঠাৎ এক সময়ে বারোটা টাকা আবিষ্কার করে টিনের বাক্সটায়। দু-টাকার নোট আর দশ টাকার নোট। না, সে অবুঝ নয়, সে জানে যে, প্রাণধারণের এই নিদারুন গ্লানিকেও কিনতে হয়। দু'টাকাটাই নেবে সে। উপায় নেই, দিনকালই এমনি পড়েছে—

দু'টাকার নোটটা মুঠোয় করে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পানু। বাইরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল নিঃশব্দে। মনসাতলা বাই লেনে একদল হন্যে কুকুরও আছে—মা তাদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

গলিতে বেরিয়েই দূরের দিকে নজর পড়ল পানুর। রামহরি

বাবুর নিঝুম বারান্দাটাতে আবার সেই সা-লা। আচ্ছা দাঁড়াও যাচ্ছ। পা টিপে টিপে এগোল সে ডানদিকের প্রান্ত দিয়ে। প্রশান্তবাবুদের বারান্দা দিয়ে কিষুণের মুড়িমুড়কির দোকানের প্রায় গা ঘেঁষে, নিতাই বোসের মুদি দোকানের ঝাঁপির তলা দিয়ে। ব্যাস্—তারপর এক দৌড়।

সেই মেয়েলী ছোক্রা তাকে দেখে সরে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু পানুর সঙ্গে পারা কি চাট্টিখানি কথা। এক লাফে হাতটা চেপে ধরল পানু।

পারুলদের জানালার দিকে ত্রস্তে তাকাল ছোকরা। পানুও তাকাল। পারুল সরে গেল জানালা থেকে। ছোকরাকে দেখেই হয়ত পারুল লজ্জা পাচ্ছে কথা বলতে। আচ্ছা যাচ্ছে সে।

"কি ? তোমায় না মানা করেছিলাম—"

"বাঃ—আমার মনে তো কোন কুমতলব নেই দাদা—এমনি—"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—এমননিই বটে—তুমি ভাবদশায় এগিয়ে আসো, তাই না মানিক—সা—লা—

ধাঁই করে ঘুষি বসিয়ে দিল পানু।

"বাপ্"—বলে ছোকরা ছিট্কে পড়ল বাঁধানো গলির ওপর। তারপর কোন মতে উঠে এক দৌড়। পানু দৌড় দেখে হাসল, শরীরের পেশীগুলো যে টান টান হয়ে উঠেছিল তা আবার শিথিল হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু কেমন যেন একটা তৃপ্তি আর অতৃপ্তি মেশানো অবসাদ এল মনে। ঘুষি মেরে আনন্দ হয়েছিল—আরো না মারার জন্য কেমন যেন অতৃপ্তি বোধ হচ্ছে।

কড়াটা নাড়ল সে।

জানালার গোড়ায় পারুলকে দেখা গেল। চুলগুলো তার তেলেজলে চক্‌চক্‌ করছে, পিঠের ওপর ছড়ানো। বাতাসে বোধহয় মৃদু একটা সুবাসও ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে পানুর চেতনায়। পারুলের দেহসৌরভ।

"সেই ব্যাটা কানাই—মনসাতলা লেনকে কদমতলা ভেবেছিল"—

"তা কি করলে?" পারুল কঠিন একটা ভঙ্গী করে বলল।

"দিলাম সালাকে একটু ভদ্রতা শিখিয়ে—"

"ওঃ—"

"ভাল করিনি?"

"তুমিই জানো—"

"অমন করে কথা বলছ কেন পারুল—মা কোথায়?"

"ঘরে"—

"দরজাটা খোল না—একটু গল্প করি"—

"আমার সময় নেই—"

পারুল বিদ্যুদ্বেগে জানালা থেকে সরে গেল। যাঃ সা-লা—। মেয়েমানুষদের নাকি দেবতারাও বোঝে না। তিলু তাকে বার বার সাবধান করে বোকার মত ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিল। সে কি কোন বোকামী করে ফেলল! না মাইরি, এ এক যন্ত্রণা। যাকগে ছাই, পরে দেখা যাবে। এক লাফে কি প্রেম হয়? সিনেমাতে কত দেখেছে সে—

বড় রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় সে।

সেই একই জীবনের ধারা। নদীর ধারার মত। সকাল

থেকে আর এক সকাল পর্যন্ত তার নানা রূপ। ঋতুচক্রের আবর্তনে যেমন নদীর চেহারা বাড়ে, কমে। শব্দ আর কোলাহলে স্পন্দিত, কম্পিত মহানগরী। যেন ঘোর লাগে পানুর। দু'ধারের ফুটপাতে কত রকমের 'দোকান, কত রকমের ফেরি করছে রিফিউজি ছেলেরা। একটা কিছু করতে হবে। মনসতলা বাই লেন থেকে সে তাদের পরিবারকে তুলে নিয়ে যাবে বালিগঞ্জে। না তো অন্য কোন সুন্দর জায়গায়। মাধুরী হতচ্ছাড়ীকে একটা কানা দর্জির সঙ্গে বিয়ে দেবে। ভানুটাকে মাষ্টার রেখে পড়াবে। বাবাটা তার দুঃখটা বুঝল না। চুলোয় যাকগে তার দুঃখ—সব ঠিক হয়ে যাবে। মনসাতলা বাই লেন থেকে সরে যাবার সময় সে জীবনে একটি ডাকাতি করবে। একটা মেয়েকে।

শব্দ—কোলাহল—যেন ঘোর লাগে। শরীরের মধ্যে একটা দুরন্ত বাসনা। কি করবে সে? কি কাজ করবে সে? তার ঘুষিতে জোর আছে, তিন মিনিট দম বন্ধ করে থাকতে পারে সে, সাঁতারে তাকে কজন হারাবে? মাঝে মাঝে শরীরের মধ্যে উদ্দাম একটা শক্তির আলোড়ন টের পায় সে। সে সব পারে কিন্তু কি করবে এখুনি? কে বলে দেবে? হাতের আঙ্গুলগুলো নিস্‌পিস্ করে তার।

এদজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগল।

লোকটা মোটা সোটা, সাহেবী পোষাক পরা।

"চোখে দেখেন না—নাকি?" লোকটা মুখ বিকৃত করল।

"খুব দেখি—"

"ছাই দেখেন—মনে তো হচ্ছে চোখ নেই"—

"মুখ সামলে মসাই—"

"চড়িয়ে মুখ তোমার—"

"তবেরে সা—লা—"

বিদ্যুতের মত হাতটা সামনে ছুটে গেল। ভদ্রলোক ফুটপাতে চিৎপাত। ছোট খাট একটা ভীড় জমে গেল। দুটো পক্ষে বিভক্ত হয়ে গেল সে ভীড়। কিন্তু ততক্ষণে জগন্নাথ কেবিনের লোক এসে গেল, ছুটকু এসে গেল। কিছুই হল না। ভদ্রলোক নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সরে পড়ল।

তৃপ্তি আর অতৃপ্তির একটা অন্তর্দাহী জ্বালা নিয়ে পানু বলল, "একটা বিড়ি দে তো ছুটকু—"

বিড়ি ধরিয়ে জোরে জোরে টানতে লাগল পানু। আরো কয়েকটা ঘুষি মারলে হত। শক্ত, নিরেট দেওয়ালের ওপর একদিন সে অনেকক্ষণ ধরে ঘুষি মেরে মেরে ভেতরের এই অন্ধ আবেগকে শেষ করে দেবে।

"চল্ চা খাই"—ছুটকু টানল হাত ধরে।

খানিক বাদে তিলু, অজিত এসে পড়ল।

এক পেয়ালা করে চা নিয়ে ওরা অনেকক্ষণ কাটাল, তারপর বেরোল।

সিনেমাতে খুব ভীড়। ধাক্কাধাক্কি করে কিউয়ের মধ্যে ওলটপালট করে ওরা টিকিট কাটল। তারপর সিনেমা হল।

অন্ধকারে এক নতুন জীবন আর জগৎকে দেখে পানু। বড় বড় চকচকে বাড়ি, ঝকঝকে পোষাক, মিষ্টি-মিষ্টি প্রেমের কথা, হাসি ও অশ্রুর হাট। দেখে ভাল লাগে, বারবার পারুলের কথা মনে হয়, তার সঙ্গে অসহ্য একটা জ্বালা বোধও হয়। কেন তা সে বোঝে না—সা-লা—।

সিনেমা শেষ হয়।

বাইরে রাতের মহানগরী। সিনেমা হাউসের আলো, এবাড়ী-ওবাড়ী আর দোকানপাটের আলো, ট্রাম-বাসের আলো। কত আলো! মনসাতলা বাই লেনেও তো আলো আছে, তবু কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হয়, কেমন যেন—

"ইস্—কী বই মাইরি—"

"নার্গিসটা দেখতে একটু ভাল ছিল বলেই যা—নইলে সালার বই—"

"খিদে পেয়েছে মাইরি—"

"চল্ পুরীধামে—"

আবার চায়ের দোকানে বসে তারা। গল্প হয় সিনেমার। তা থেকে যুদ্ধের। তারপর এটম বোমা। তিলু বলে যে এবার সব শেষ হবে। অজিত বলে যে বাঁচা যাবে।

পানু বলে, "দূর সালারা—বাজে বক্‌বক্ করছিস্—একটা বিড়ি দেতো কেউ—"

কিছুই ভালো লাগে না। এ কি রোগ হয়েছে পানুর!

রাত এগারটা নাগাদ গলিতে ঢুকল পানু। পারুলদের বাড়ির সামনে ঢুকে দেখল যে জানালা দিয়ে আলো এসে বাইরে পড়েছে। পারুল কি জেগে?

পা টিপে টিপে জানালার ধারে গেল সে। ও বাবা, কৃপানাথবাবু পা নাচিয়ে গড়গড়া টানছেন। দেয়াল ঘেঁষে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে, পায়ের তলা থেকে একটা ইঁটের টুকরো তুলে ছাঁতনা-ধরা দেয়ালে লিখল—'পারুলকে ভালবাসি'—। দূরে গলির ল্যাম্পটার—আলোটা পড়েছে তার

সেই ঘোষণার ওপর—একবার তা দেখে পান্নু এগিয়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকতেই ব্রজেশ্বর সামনে এসে দাঁড়াল।

"বেরো বাড়ি থেকে"—সুস্পষ্ট তার আদেশ।

"কেন?" বন্য একটা হিংস্রতা পান্নুর চোখে জ্বলে উঠল।

"চোর—হতভাগা ইস্টুপিড—বদমাস—বেরো বলছি—"

মাধুরী আর বুধুরা ছুটে এল। প্রভাবতী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

"আমি কিছু নিইনি"—পান্নু দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

প্রভাবতী গালে হাত দিল, "তুই দু'টাকা নিসনি?"

"না"—

ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দিল ব্রজেশ্বর, "মিথ্যুক—শয়তান—বেরো বেরো এখান থেকে। খবরদার আজ ওকে যে বাড়ি ঢুকতে দেবে সে আমার মরা-মুখ দেখবে—"

পান্নু ঝড়ের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চড় মারল তাকে! বাবা তাকে মারল!

কি হল? পারুল অমন রাগল কেন? কি করেছে সে? তাহলে—তাহলে কি ঐ মেয়েলি ছাঁদের ছোকরাকেই—সা—লা।

কিন্তু আজ তার কি হল? সব দরজাই যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! হাতটা নিস্‌পিস্ করছে—দেয়ালে ঘুষি মেরে দেখলে কেমন হয়?

রাজপথই ভাল। এখানে আজ খুব উত্তেজনা। তিলুদের কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না আজ—কি হল ওদের? বড় একা লাগছে। একা একা কিছু জমে না। ঠিক আছে। একটু পরে তিলুদের বাড়ীতেই যাওয়া যাবে। ভবিষ্যৎটা

নিয়ে একটা আলোচনা করতেই হবে। জীবনটা বড় জটিল, বড় অন্ধকার হয়ে উঠল। কি হবে? কি করবে সে? কেউ যদি বলে দিত—কেউ যদি হাত ধরে টেনে নিত—যদি কেউ বলত, 'পানু, তুমি ম-স্ত বড় বীর হবে।' কিন্তু কেউ বলল না। বাবা মা অপদার্থ বলল, পারুল বলল গুণ্ডা। অথচ সে নিজে জানে না সে কী।

ঢং ঢং ঢং—

একটা ট্রাম সবেগে ছুটে আসছে।

"মার শালাকে—মার শালাদের"—

"বন্ধ কর গাড়ী"—

"মার—মার"—

চারদিক থেকে লোক জড় হল—ঢিল, ইঁট ছুঁড়তে লাগল ট্রামটির গায়ে। ট্রামের জানলার কাঁচ ভাঙল, ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল। তু' একজন যাত্রী যারা ছিল, তাদের হিড় হিড় করে টেনে নীচে নামাল সবাই। ভয়ে তাদের কাছা আলগা হয়ে গেল, ছাড়া পেয়েই প্রাণভয়ে চোঁ চাঁ দৌড় মারল তারা—সা—লা—।

পানুর হাসি পেল। একটা বিড়ি ধরাল সে। বেড়ে ছে চারদিকে। সিনেমার চেয়েও মজেদার—নাঃ, সিনেমার চেয়ে জীবন ঢের বেশী উত্তেজক। উদাহরণ সে নিজে। তার জীবন কি কম রোমাঞ্চকর? আজ কি তার জীবনে কম ঘটনা ঘটেছে। অশোককুমার, দিলীপকুমার, রাজকপুর—সব ব্যাটারাই বর্তে যাবে পানুর পার্ট পেলে। শুধু তার গল্পের শেষটা নেই। চারদিকে বিশৃঙ্খল অরাজক আবহাওয়া—তার মাথার মধ্যেও একটা অরাজক অনুভূতি।

ঢং ঢং ঢং ঢং—

আর একটা ট্রাম আসছে।

খিদে পেয়েছে।—সা—লা।

"মার—মার শালাকে"—

ইঁট ছুটছে।

কাঁচ ভাঙ্গছে।

ড্রাইভার পালাচ্ছে।

"ধর—ধর সালাকে—মার"—

পানু দাঁত মেলে হাসল, এগিয়ে গেল ট্রামটার দিকে। বাঃ, ট্রামের চেহারাটা বেশ বিগড়ে দিয়েছে।

একজন বাবুকে ওঠবোস·করাচ্ছে ক'জন ছোক্‌রা। পানু এক পাশে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল হ্যা হ্যা করে।

মোটামত বাবু ঘেমে উঠেছে।

"আর ট্রামে চড়বি যাদু—ওঠ সা—লা"—

"বোস্"—

"ওঠ্"—

"বোস্"—

"দে সালার ট্রামে আগুন লাগিয়ে—"

"হাঃ হাঃ হাঃ—দে—"

চারদিকে কারা? এদের সঙ্গে তার যেন কোথায় মিল আছে। দেয়ালে ঘুষি না মেরে ওরা ট্রামে আগুন দেয়। কিন্তু যাই বল, বেশ মজা। যদি কেউ বলে দিত কী করব, কী হব!

"দেশলাই—একটা দেশলাই—"

দূরে কোলাহল। অন্য ট্রাম থামাচ্ছে।

"তেল ঢেলেছিস ?"

"পুলিশ – পুলিশ—"

পুলিশ ভ্যান আসছে দূরে।

জনতা ছড়ায়, সরে, একটু সতর্ক হয়ে দাঁড়ায়।

"দে না দেশ্‌লাই—কোথায় ?"

কে যেন ওদিকে ঢিল মারছে।

"একটা দেশ্‌লাই—"

পান্নু দেশলাই বের করে ছোকরার পাশে দাঁড়ায়। এ কি, ছোকরা যে অবিকল তার মত দেখতে !

"জ্বালান দেখি – "

পান্নু দেশ্‌লাই জ্বালে।

"দিন"—সেই ছোকরা কাঠিটা টেনে নেয়। অবিকল তার মত চেহারা ! এই উত্তেজিত ধ্বংসের জীবন—এ দেখেও যেন মনে পড়ে। কী যেন চাই।

"মার মার—মার—"

"পুলিশ—পুলিশ—"

"পালা"—

"মার—"

একটা হুড়োহুড়ি। দাউ দাউ করে জ্বলল ট্রামটা। আগুনের শিখাটা থেকে সরে যায় পান্নু। কিন্তু বড় ঠেলাঠেলি।

"সরো—সরো—"

"পুলিশ—"

হঠাৎ এক রাউণ্ড গুলি এল।

"পালাও—পালাও—"

দুড়দাড় পায়ের শব্দ। রাস্তা প্রায় পরিষ্কার। শুধু জ্বলন্ত

ট্রামটার পাশে পান্নু পড়ে থাকে। তার বাঁ পাঁজরার দিকে গুলি লেগেছে। রক্ত কল্ কল্ করে বেরোচ্ছে—যেন শিবের জটাজাল থেকে সুরধনী মুক্তি পেয়েছে। চারদিকে দেয়াল দেখে দেখে দিশেহারা প্রাণটা আজ মুক্তি পাচ্ছে। সব দরজা বন্ধ হয়েছে আজ। বাবা—পারুল—কিন্তু তার বদলে একটা নতুন দরজা আজ খুলল। কিন্তু এতো চায়নি সে, এতো চায়নি। অনন্ত আশ্বাসে ভরা অনন্ত প্রাচুর্যে ভরা জীবনের যে পথ—কেউ যদি বলে দিত · কেউ যদি—

মনসাতলা বাই লেনে এখন কতটা অন্ধকার? চোখের সামনেকার এই পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের মত জীবনে যে এত অন্ধকার তা তো পান্নু জানত না—সব অন্ধকার হয়ে আসছে—চোখের দৃষ্টি, চৈতন্য, শক্তি—। শুধু একটা জিনিষ স্পষ্ট, স্পষ্টতর হয়ে উঠছে—মনসাতলা বাই লেনের ছাঁতলাধরা দেয়ালের ওপর ইঁটের টুকরো দিয়ে লেখা দু'টি কথা—

ত লা নি

ছেলেটা লুকোবার চেষ্টা করল।

আপিস টাইমের ভিড়, কিন্তু তবু আমার সন্ধানী সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারল না ছেলেটা। আজকাল ট্রাম-কোম্পানিতে একটু কড়াকড়ি শুরু হয়েছে, ইন্‌স্পেক্টাররাও বাধ্য হয়ে কড়া নজর রাখে। আর সেকেণ্ড ক্লাসগুলোতেই যত রাজ্যের ফাঁকিবাজ, চোর-জোচ্চোর আর বদমাশদের ভিড় হয়। ফলে আমরা যারা সেকেণ্ড ক্লাসে কন্‌ডাক্টরি করি তাদের পদে পদে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয়, ঝগড়া করতে হয়, মারামারিও যে মাঝে মাঝে হয়, একথা অস্বীকার করতে পারব না। তাই দম ফেলতে পার না, ইচ্ছে করলেও দয়া দেখাবার উপায় নেই। আপনি বাঁচলে বাবার নাম—বাপ্, যা দিনকাল পড়েছে।

ধরলাম ছেলেটাকে, "এই ছোঁড়া, তোর টিকিট?"

ছেলেটা ভয় পেল না, হাসল। কালো, রোগা চেহারা।

পাঁচ-ছ বছর বয়েস। পরনে একটা কালো রঙের হাফপ্যান্ট, আধছেঁড়া, ময়লা চিটচিটে একটা শার্ট, গায়ের ওপর জমানো ময়লা কালো আভাস। আর উজ্জ্বল দুই চোখ, কুকুরের চোখের মতো। বন্য আর নির্ভয়। কোথায় যেন দেখেছি ছেলেটাকে!

"হাসছিস যে! টিকিট কই?"

"নেই।"

"কেন নেই?"

রাগ হল। এই ছোঁড়াগুলো ভারি জ্বালাতন করে। যুদ্ধের পর কোথা থেকে যে এদের আমদানি হচ্ছে। পিল্‌পিল্‌ করে যেন বেড়ে চলেছে শয়তানেরা।

কানটা ধরে একটু মনের ঝাল মেটাতে চাইলাম, "বল্‌ কেন নেই?"

আমার হাতের ওপর ধাঁ করে একটা চড় মেরে এক ঝটকায় কানটাকে মুক্ত করে নিয়ে ছেলেটা ফুঁসে উঠল, কুটিল চোখে বলল, "নেই।"

"নেই তো চড়েছিস কেন?"

"নেমে যাব।"

"নেমে যাব! বটে! তার আগে তোমাকে আমি পুলিসে দেব।"

যাত্রীরা ব্যাপারটা উপভোগ করছিল, কয়েকজন সহাস্যে সমর্থন করল আমাকে।

একজন বলল, "পুলিসেই দিন দাদা। এমনিভাবে ভেসে ভেসেই এরা কালে তামাদের পকেট মারবে, গলা কাটবে আর রিভলবার নিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকবে।"

আর একজন ছেলেটাকে প্রশ্ন করল "হ্যাঁরে ছোঁড়া, তোর মা-বাপ নেই ?"

ছেলেটা ঠোঁট বাঁকা হয়ে উঠল, দুচোখের তারায় আক্রোশ ঝিলিক দিয়ে গেল। সে জবাব দিল না। কোথায় যেন দেখেছি ছোঁড়াকে !

"আহা গোসা করছ কেন বাবা—বলো না—"

"ন্নেই", ধমকে জবাব দিল ছেলেটা। যেন কোণঠাসা কুকুরছানা দাঁত খিঁচলো।

জগুবাবুর বাজারে ট্রাম থামল।

আমি ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিলাম, 'যা ভাগ—"

ছেলেটা নেমে গেল, কয়েকহাত দূরে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সা-লা।"

"অ্যাই !" ধমকে উঠলাম।

ছেলেটা নড়ল না, দুচোখ পাকিয়ে, একটা হাত তুলে শাসানির ভঙ্গিতে আবার বলল, "ইট মেরে তোর মাতা ভেঙে দেব—তোর মুখে হেগে দেব—

হুড়মুড় করে যাত্রীরা উঠছিল। তাদের ভেতর দিয়েই চটেমটে নামবার চেষ্টা করছিলাম এমন সময় ফার্ষ্ট ক্লাসের ঘণ্টা বেজে উঠল। বাধ্য হয়ে থামলাম, আমিও ঘণ্টা বাজালাম। ট্রাম চলতে শুরু করল।

সমস্ত কোলাহলকে ভেদ করে ছেলেটার তীক্ষ্ণ গলা আবার ভেসে এল, "এই সালা—এই—এই সালা—"

ট্রামের পাশাপাশি কয়েক পা দৌড়ে এল সে, গালাগালি করতে করতে। শেষে এক-সময়ে থেমে গেল। আর সেই সময়েই ছেলেটাকে চিনতে পারলাম।

যাত্রীরা সহানুভূতি জানিয়ে বলল, "দেখেছেন মশাই দেখেছেন, সালার ছেলে যেন একেবারে বিচ্ছু—"

"হবে না, ব্যাটাদের মা-বাপের ঠিক নেই যে—"

হয়তো তাই। কিন্তু ঐ ছেলেটার মা-বাপ ছিল। আমি তাদের দেখেছি। অন্তত ওর মাকে আমি বহুদিন ধরেই চিনতাম। সে চেনা অবশ্য শুধু দেখার। কন্‌ডাকটরি করতে করতে ট্রামের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখতাম ওর মাকে। সে কবেকার কথা। সেই যেবার আমি কন্‌ডাক্‌টর হয়ে কেম্পানিতে ঢুকলাম তার মাসকয়েক পর থেকেই—

এলগিন রোড পার হল ট্রামটা! তারপর থিয়েটার রোড। গতি বাড়ল ট্রামের। চাকায় চাকায় শব্দ উঠল। কর্মব্যস্ত জগতের ধ্রুপদের সঙ্গে যেন পাখোয়াজের বোল তুলে আমার ট্রাম এগোল। মাঝে মাঝে তারের গায়ে বিদ্যুতের তীব্র ঝলসানি যেন মাত্রা নির্দেশ করতে লাগল। দুলে দুলে ভিড় ঠেলে ঠেলে, টিকিট দিতে দিতে গলদঘর্ম হয়েও কিন্তু ছেলেটার মায়ের কথা এড়াতে পারলাম না। সব মনে পড়তে লাগল।

বিয়াল্লিশ সনে ম্যাট্রিক পাশ করেই ট্রামের চাকরিটা পেলাম। বারকয়েক ফেল করার পর অতি কষ্টে পাশ করেছিলাম। তাছাড়া সামর্থ্যও আর ছিল না, আমাকে দেখলেই দাদা-বৌদির মুখ অন্ধকার হয়ে উঠত। তাই বাবু শ্রেণীতে টিঁকে থাকার করুণ চেষ্টা না করে একধাপ নিচেই নেমে গেলাম।

তখন বিয়াল্লিশের গোলমাল শুরু হয়েছে। কন্‌ডাক্টরি করতে করতে ক্রীতদাসত্বের জ্বালায় জ্বলি আবার ভয়ে ভয়েও

থাকি। দেশের উত্তেজনা মাঝে মাঝে ট্রামের ওপর হিংস্রতায় ভেঙে পড়ে। সেই বিপ্লবের দিনেই আমার চাকরি-জীবনে হাতে-খড়ি। তারপর বিয়াল্লিশ সন গেল তেতাল্লিশ এল। পৃথিবীময় তখন যুদ্ধ চলেছে। ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তেও যুদ্ধ-দানবের লোহার রথ এগিয়ে এল। দেশের মৃত্যু এল দুর্ভিক্ষের রূপ নিয়ে।

কত মৃত্যু দেখলাম তখন। দেখে দেখে মন তখন নিরাসক্ত হয়ে উঠেছে। নিত্যদিন বিদ্যুৎ-যানের মধ্যে, ভিড়ে, গরমে, ঘামে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট বেচে বেচে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু তবু প্রমোশন পেলাম না। সেকেণ্ড ক্লাসেই দিন কাটতে লাগল আমার।

সেই সময়। বোধ হয় সেটা শ্রাবণ কি ভাদ্র মাস। অশ্রান্ত বর্ষনের ফলে সেদিন সন্ধ্যের পর সবে রাস্তায় জল জমতে শুরু করেছে। বৃষ্টির জন্য ট্রামে ভিড় হয়নি। সেদিন আর দাঁড়িয়ে নেই আমি, বসে বিড়ি ধরিয়েছি।

ট্রামটা থামল পূর্ণ থিয়েটারের সামনে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই ছোট্ট একটি ছাতা মাথায় দিয়ে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে ট্রামে উঠে একপাশে বসল।

ট্রাম চলতে লাগল। অন্ধকার আর বৃষ্টিধারায় বাইরের রাস্তাবাড়ি সব ঝাপসা। গাড়ির কাচ নামানো। বাধ্য হয়ে ভেতরের যাত্রীদের দিকে তাকাতে তাকাতে মেয়েটির ওপর নজর পড়ল। মনে হল একে যেন কোথায় দেখেছি। একটু ভাবতেই চিনতে পারলাম। কদিন ধরেই মেয়েটিকে ঠিক সন্ধ্যের পর ট্রামে দেখি। এসপ্ল্যানেডে গিয়ে নামে রোজ। আর ফেরে সেই শেষ ট্রামে।

ভালো করে তাকালাম। অল্প বয়স কিন্তু অনুপাতে যে শ্রী থাকা দরকার তা নেই। রোগা, গালভাঙা, শুকনো। একটা রঙীন সস্তা সাড়িকে যথাসম্ভব গুছিয়ে আঁটসাট করে পড়েছে। গলায় একটা পুঁথির মালা, হাতে কাঁচের চুড়ি, মাথায় চুল আছে খুব, সেগুলো সযত্নে মস্ত বড় খোঁপায় বাঁধা। মুখের ওপর পাউডারের একটা ক্ষীণ আভাস আর অল্প-দামী এসেন্সে সুরভিত ছোট্ট একটা রুমাল হাতে। এতে আকৃষ্ট হবার কিছুই ছিল না। কিন্তু সব মিলিয়ে মেয়েটির যে বসার ভঙ্গি, মুখের মধ্যে যে পাকা পাকা ভাব আর চোখের মধ্যে যে আশ্চর্য একটা জ্বালাময় দীপ্তি ছিল তা আমাকে আকৃষ্ট করতে বাধ্য করল। আমি তখন যুবক, বাইশের কোঠায় পা দিয়েছি, রক্তে আমার উগ্র পৌরুষের সঙ্গে লোভ-লালসার অনুচর। কিন্তু জীবন কি সেটা টের পেয়েছিলাম বলেই রাশ আমার হাতছাড়া হয়নি আর মানুষের মুখ দেখেই তার চরিত্র অনুমান করে নেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মেছিল। সেই ক্ষমতাবলেই আবিষ্কার করলাম যে ঐ মেয়েটির চোখে গভীর পাঁকের বিষাক্ত ইতিহাস।

এসপ্ল্যানেড নয়, মিউজিয়ামের কাছাকাছি আসতেই মেয়েটি একবার এদিক ওদিক দেখে ছাতাটা খুলে নেমে গেল।

বুড়ো ইন্‌স্পেক্টর তারিণীদা ছিলেন তখন আমাদের ক্লাসে, মেয়েটি যেতেই বললেন, ঐ গেল একটি"—

প্রশ্ন করলাম, "কী গেল তারিণীদা ?"

তারিণীদা গাল দিলেন, "শালা ন্যাকা সাজছিস—বিদ্যে-ধরীদের তুমি দেখনি ?

"বিদ্যেধরী! ওইটুকু তো মেয়ে"—ইচ্ছে করেই বোকা

সাজলাম। তারিণীদাকে চটালে লাভই হয়।

"ওইটুকু!" তারিণীদা অনুকম্পার হাসি হেসেই আমাকে নস্যাৎ করার উপক্রম করলেন, "আরে এই কলিতে সবই সম্ভব। আর তোদের দেশে তো ওসব আকছার চলেছে। তোদের দেশের রাজা থেকেও রাজা নেই, তোরা দেশের লোক হয়েও মানুষ নস্ তো ওসব হবে না? তাছাড়া ইজ্জত বেচেও কিছু হয় না, তারপরেও তো ফুটপাথে মরেরে শালা। তোদের দেশে ওটুকুই মেয়েরাও রাতের আঁধারে এই ঝড়জলের রাতে ঘুরে বেড়ায় আর তোরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোস। ঘুমোবিই তো—তোরা কি মায়ের দুধ খেয়েছিস"—

বাধা দিয়ে বিনীতকণ্ঠে বললাম, "মায়ের দুধ তুমি খেয়েছ তো তারিণীদা?"

"আমি!" তারিণীদা মাথা নাড়লেন, "না। তাছাড়া আমি তো তোদের মতো ব্যাটা ছেলে নই, মেয়েছেলেও না। আমি তা জানি না, তা ভাববারাও চেষ্টা করিনি—শুধু দিনরাত একটি কথাই মনে রেখেছি যে আমি মনে ট্রাম কোম্পানির একজন টিকিট ইনস্পেক্টর"—

এসপ্ল্যানেড। কারো দিকে না তাকিয়েই তারিণীদা নেমে গেলেন।

তারিণীদার কথাগুলো ভাবলাম। কথার মধ্যে বুড়ো এমন একটি আবেগ সঞ্চারিত করেছিলেন যে অনেকক্ষণ ধরে ট্রামের তালে তালে তা আমার মাথায় হাতুড়ির মতো আঘাত করেছিল। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কথাগুলো আমাকে লজ্জা দিয়েছিল।

তারপরেও দু'তিনদিন আমি মেয়েটিকে লক্ষ্য করলাম।

সেই একই রকম প্রসাধন তার। সন্ধ্যের পর সে ট্রামে ওঠে। নিঃশব্দে, ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও করুণ ভঙ্গিতে এককোণে বসে থাকে। নড়ে না চড়ে না, কিন্তু তার জ্বলজ্বলে চোখের তারা দুটো কামরার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে দেখে নেয়। যেন কী খোঁজে সে। কাজের ফাঁকে তার সেই সন্ধানী দৃষ্টির গতি লক্ষ্য করেছি আমি। আমাকেও রেহাই দেয়নি তা, লেহন করেছে আমার সর্বাঙ্গ!

এমনিভাবে কদিন কেটে গেল।

সেদিন বিকেলে আমার ডিউটি ছিল না। শ্যামবাজারে আমার মাসিমার ওখানে বেড়াতে গিয়ে ফিরতে প্রায় রাত দশটা হল। এসপ্ল্যানেডে এসে একটা টালীগঞ্জগামী ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এমনি সময়ে লক্ষ্য করলাম সেই মেয়েটাকে। ওয়েটিং-রুমের একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকেই চোখ রাখলাম তার ওপর। কি করে?

লোকজন আসছে, দাঁড়াচ্ছে, গল্প করছে। দু'একজন পায়চারি করছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে তাদের মধ্যে একজন আধাবয়সী পশ্চিমা লোক পায়চারি করতে করতে মেয়েটিকে দেখল, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে মেয়েটির দু'তিন হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল, পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল লোকটা। ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ছেড়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে কী যেন বলল। মেয়েটা আস্তে আস্তে তার দিকে মাথা ঘোরাল। লোকটা আবার কী যেন বলল। মেয়েটা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সোজা এগিয়ে গেল কার্জন পার্কের দিকে। লোকটা দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

বালিগঞ্জের একটা ট্রাম এল। একদল লোক আমার সামনে দিয়ে ছুটে গেল। দৃষ্টিপথ পরিষ্কার হতেই দেখলাম যে লোকটা সেখানে নেই।

কৌতূহল মেটাবার জন্যে পার্কের দিকে এগিয়ে গেলাম। ঠিকই ধরেছি। আধো অন্ধকারেও প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে সেই মেয়েটিকে দেখতে পেলাম। তার পাশেই লোকটা। মাঠের নির্জনতা আর অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা।

নতুন করে তারিণীদার কথাগুলো মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগল যে-বিদ্যুতে লোহার ট্রাম মাটি কাঁপিয়ে ছোটে সেই বিদ্যুতের মতোই একটা নাম-না-জানা ঢেউ আমার রক্তে দোলা দিল, বারবার আমার পেশীগুলোতে এসে মাথা খুঁড়তে লাগল। তবুও কিছু করতে পারলাম না।

কদিন পর। আবার বিকেলের দিকে ডিউটি। আবার মেয়েটাকে দেখলাম। দেখেই কেমন যেন রাগ হল। তারিণীদা'র কথা সত্য। কিন্তু দেশের অবস্থা তো একদিনেই বদলাতে পারব না আমরা। ততদিন কি এইভাবেই গোল্লায় যাবে সব?

টিকিট চাইতে গিয়ে কড়া নজর মেলে তাকালাম মেয়েটার দিকে।

মেয়েটা একটা দু আনি দিয়ে আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, "এসপ্ল্যানেড"—তার পরেই মুখ ফিরিয়ে নিল।

টিকিটটা পাঞ্চ করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কি বল তো? তোমায় যেন চিনি।"

মেয়েটা তাকাল আমার দিকে, তার চোখের তারায়

শানিত দীপ্তি। কিন্তু মুখের কোথাও এতটুকু রেখাপাত হল না তার, স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আপনি আমাকে চেনেন না"—

"নামটা কি বলোই না।"

"না টিকিট দিন।"

টিকিটটা দিয়ে বললাম, "রোজই রাতের বেলা বাড়ি থেকে বেরোও তুমি—কেন?"

"আপনার তাতে দরকার কি?" মেয়েটার গলাতে প্রচণ্ড ঝাঁজ।

"তোমার মা-বাবা নেই?"

"তাতেই বা দরকার কি আপনার? যান, টিকিট বেচুন গে—"

চটে আরো কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একজন যুবক যাত্রী হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, "অত জেরা করছেন কেন মশাই? আপনি কি দারোগা সাহেব?"

বললাম, "দেখছেন না এ কী?"

মেয়েটা সাপের মতো ফুঁসে উঠল, শুনছেন? শুনছেন আপনারা? কি ছোটলোক!"

সেই যুবক যাত্রীটি আমায় ধমকে বলল, "খবরদার মশাই, ফের ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে ওভাবে কথা বললে আপনাকে এবার মার লাগাব—"

কামরার মধ্যে আরো কয়েকজন ওদের সমর্থন করল। শেষ পর্যন্ত সেই অপমান হজমই করলাম।

জগুবাবুর বাজারের কাছে এসে মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। সেই যুবকটির দিকে চকিত একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নেমে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড বাদে যুবকটিও নেমে গেল।

দাঁত দাঁতে ঘষলাম শুধু।

কালিঘাট থেকে ড্যালহাউসি রুট। তারপরেও কতদিন দেখেছি মেয়েটিকে। সেই একই ভঙ্গি। নিঃশব্দ, করুণ, কিন্তু কুটিল চাউনি। দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিতাম আমি। ঘৃণায়।

হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম মেয়েটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম আপদ গেছে।

তারপর তেতাল্লিশ সন শেষ হয়েছে। যুদ্ধ একইভাবে চলেছে পৃথিবীতে। দুর্ভিক্ষের বীভৎসতা তখন আর রাস্তাঘাটে বেশি নজরে পড়ে না। যারা নিম্নবিত্ত, নিতান্ত দরিদ্র ছিল তারা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ তখন মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে হানা দিয়েছে, তার থালার অন্নের মাপ কমিয়েছে, তার নারীর লজ্জাবস্ত্রে দুঃশাসনের মতো আকর্ষণ করছে আর তাদের রক্তে এনেছে নতুন জীবনের প্রতিজ্ঞা। আমার বুকেও সে প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হয়েছে, গুমরে মরেছে, কিন্তু তবু আমি কিছু করতে পারিনি। ট্রাম চলেছে আমার—বিদ্যুতের তারে নীল আলোর স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে লোহার লাইনে লোহার চলার গান গেয়ে, পৃথিবীর মহৎ নতুনদের অশান্ত পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাটি কাঁপিয়ে। আর সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় চামড়ার থলি থেকে টিকিট বের করে সবাইকে পাঞ্চ করে দিয়েছি আমি, পয়সা গুনে নিয়েছি, ঝগড়া করেছি, বিনা টিকিটের যাত্রীদের নামিয়ে দিয়েছি। পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি বজায় রাখার দুরন্ত প্রয়াসে কখনো দেখতেই পাইনি যে বসন্তের সন্ধ্যায় নিবে-আসা দিনের রাঙা আলোর তলায়

ময়দানকে কেমন দেখায়, কিংবা শরতের দুপুরে।

শরৎ নয়, শীতকাল তখন। সেদিন বেশ কনকনে উত্তুরে বাতাস বইছিল। কোম্পানির গরম কোটেও যেন শীত আটকাচ্ছে না। এলগিন রোডের কাছে ঘ্যাঁচ্ করে ট্রামটা থেমে পড়ল। সামনেই একটা অ্যাক্সিডেণ্ট্ হয়েছে। হৈ হৈ শুরু হল। ঠায় পাঁচমিনিট বাদে ট্রামের মোটর আবার গোঁ গোঁ করে উঠল। আর ঠিক সেই সময়েই একজন যুবতী এসে ট্রামে বসে।

টিকিট চাইতে গিয়ে চমকে গেলাম। এ যে সেই মেয়েটা! আরে! চেহারাটা যে বেজায় পালটে গেছে! গায়ে গতরে মাংস জমেছে, গাল ভরেছে, ঠোঁটের ওপর হালকা·লিপ্ষ্টিকের রক্তাভা। পরনে ভালো একটি রঙীন তাঁতের শাড়ি, হাতে ব্যাগ, পায়ে ভালো চটি।

"টিকিট"—

"পাঁচ পয়সা"—মেয়েটার গলা আগের চেয়ে অনেক সরস হয়েছে।

"কোথায় যাবেন ?"

মেয়েটা তাকাল আমার দিকে। স্পষ্ট বুঝলাম যে আমাকে চিনতে পারল, কিন্তু মুখে চোখে তা ফুটে উঠল না। মুখ ফিরিয়ে বলল, "আপনি টিকিট দিন না, অত কথার দরকার কি ?"

রাগ দমন করে টিকিট দিয়ে সরে গেলাম। ব্যবসা জমিয়েছে মেয়েটা। পাপের সিঁড়ি বেয়েই ওপরে উঠেছে। চেহারাটা পালটেছে। আশ্চর্য, দেখতে ভালোই দেখাচ্ছে।

পাপাচরণের ফলে দেহের ওপর একটা বিচিত্র ছাপ পড়েছে। চোখের তারায়, ঠোঁঠের বঙ্কিম রেখায়, বসবার ভঙ্গিতে, তাকাবার কায়দায়—এক বিচিত্র বার্তা। সে বার্তা পড়তে বা বুঝতে কারো ভুল হয় না।

একটা ষ্টপ পরেই নেমে গেল মেয়েটা। আমি মুখ বাড়িয়ে দেখলাম যে এগিয়ে গিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠে বসল। ওপরে উঠছে মেয়েটা তাই আমার সান্নিধ্য এড়িয়ে গেল। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে সে আর চড়বে না।

সেকেণ্ড ক্লাসের কন্‌ডাকটর হওয়াটা সেদিন যেন কেমন খুব গৌরবের বলে মনে হল না।

মনের দুঃখটা বোধ হয় কেউ টের পেয়েছিল। কদিন বাদেই আমাকে ওয়েলিংটন্-গড়িয়াহাটা রুটের ফার্ষ্ট ক্লাসে স্থায়ীভাবে কাজ করতে দেওয়া হল।

নতুন রুটে ফার্ষ্ট ক্লাসে কাজ আরম্ভ হল। খুব মন দিয়ে কাজ শুরু করলাম নতুন উদ্যমে।

শীত গেল। বসন্ত এল।

হঠাৎ একদিন দুপুরে দেখতে পেলাম। রাতের ছায়াতে নয়, বসন্ত দুপুরের উজ্জল আলোতে। কিন্তু এ রুটে এল কী করে? তাও কি জীবিকার জন্যে?

উন্নতি হয়েছে। ধাপেধাপে অনেক ওপরে উঠেছে মেয়েটা পরনে ক্রেপ্ সিল্কের রঙীন সাড়ি, গায়ের বর্ণ ঘষামাজাতে ফর্সা হয়েই উঠেছে। গায়ের গয়নাগুলো সবই সোনার। ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে দুলিয়ে খুট্‌খুট করে সে ট্রামে উঠল, সঙ্গে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একটি স্বাস্থ্যবান কৃষ্ণবর্ণ লোক। লোকটার চেহারা কর্কশ, রুক্ষ। ঘাড়ছাঁটা, দামী জামাকাপড়।

উদ্ধত, দুর্বিনীত ভঙ্গি। কালোবাজার করে রাতারাতি বড়লোক হয়েছে। দেখেই বোঝা যায়।

"টিকিট"—মেয়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"আমি দেব," সেই লোকটা বলল।

"না, আমি", মেয়েটা বলল।

লোকটা হাসল, পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে টস করে বলল, "হেড না টেল?"

মেয়েটা বলল, "হেড।

লোকটা হাত মেলে পরাজিতের মুখভঙ্গি করল, "আচ্ছা তুমিই দাও।

মেয়েটা নির্লজ্জের মতো হেসে উঠল। একগাড়ি লোক কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই তার। হাসতে হাসতে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে অনেকগুলো নোটের ভেতর থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে আমার দিকে তাকিয়েই হাসি থামাল। সে আমায় চিনতে পারল। আমি তার জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সাক্ষী।

"দুটো চৌরঙ্গী," গম্ভীর হয়ে বলল সে।

আমি নোটটা ফিরিয়ে দিলাম, "চেঞ্জ নেই।"

বিরক্তমুখে ভুঁরু কুঁচকে মেয়েটা বলল, আমার কাছেও নেই।"

মনের ভেতরে বহুদিন ধরে একটা আক্রোশ জমা ছিল। এই মেয়েটার জন্য একদিন যে অপমানিত হয়েছিলাম সেকথা এখনো ভুলিনি।

বললাম, "তা আমি কী করব? চেঞ্জ নিয়ে বেরোতে পারেন না?"

মেয়েটার চোখেও শত্রুতা লক্ষ্য করলাম, সে বিষভরা গলায়

বলল "ছোটলোকের মতো কথা বলছ কেন?"

আস্পর্ধা দেখে জ্ঞান হারালাম, বললাম, "মুখ সামলে কথা বোলো, তোমায় আমি চিনি"—

মুহূর্তে সেই কৃষ্ণবর্ণ লোকটা আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল, "শাট্ আপ ইউ ব্লাডি সোয়াইন—শালা"—

আচম্‌কা। সামলাবার আগেই একটা চড় এসে লাগল গালে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও লাফালাম। যাত্রীরা হৈ হৈ করে উঠল। ইনস্পেক্টর ইদ্রিস মিঞা এসে পড়ল মাঝখানে। সবাই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করল, চাকরি বাঁচাবার জন্য সেই মেয়েটা আর সেই লোকটার কাছে মাপ চাইতেও হল। তবু আমার কথা বলতে পারলাম না। আর সেকথা বললেই বা কে বিশ্বাস করত? ঐশ্বর্য থাকলেই আজকের সমাজে সম্মান পাওয়া যায়। টাকা থাকলে চোর-লম্পটেরাও আজকের সমাজে সাধু এবং বিশ্বাসভাজন বলে নাম কেনে। ষাট টাকার চাকরি যার জীবন-ভোমরা তার কথায় কান দেবে কে?

ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ায়নি। ইদ্রিস মিঞা রিপোর্ট করতে বাধ্য হয়েছিল, তবে বাঁচাবার চেষ্টাও করেছিল। অস্থায়ীভাবে আরো কিছুদিন কাজ চলবে কিন্তু হঠাৎ একদিন যে আবার সেকেণ্ড ক্লাসে ফিরে যেতে হবে তা বুঝতে পারলাম।

মনের ভেতর অপমান জমা হয়ে রইল। অক্রোশের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল। একদিন কি সুযোগ পাব না? তারিণীদার কথা সব বাজে। এদের জন্য দরদ দেখানোর কোনো মানে হয় না।

বসন্তের পর গ্রীষ্ম এসেছে তখন। আবার দেখলাম ওদের। দুজনকেই।

এঁকি! মেয়েটার কপালে সিঁদুর। না, ভুল দেখেছি। সিঁথিতে নেই শুধু কপালে। গৃহস্থ-বধু সাজার চেষ্টা করেছে। ওরা চিনল ঠিকই। কিন্তু আজ আর কোনো গণ্ডগোল হল না।

ওদের কথাবার্তা শোনার কৌতূহল হয়েছিল আমার। চেষ্টাও করেছিলাম। অতি সাধারণ কথাবার্তা। শাড়ি, সিনেমা, চাকরবাকরের গল্প, লোকটার নতুন কনট্র্যাকটের কথা।

আশ্চর্য হয়েছিলাম। মেয়েটা আজকাল তরতর করে বেশ কথা বলে।

ট্রাম থেকে ওদের নেমে যাবার সময় একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। মেয়েটার সন্তান হবে। আশ্চর্য! আর কত দেখব!

তারপর অনেকদিন দেখিনি ওদের। আবার দেখলাম পঁয়তাল্লিশের গোড়ায়। তখন আমি টালিগঞ্জ থেকে ড্যালহাউসিতে কাজ করছি। আবার সেই সেকেণ্ড ক্লাসে। দেখলাম মেয়েটার কোলে একটা ছেলে। সঙ্গে লোকটা কিন্তু মেয়েটাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। লোকটাও কথা বলছে না বেশী, গম্ভীর হয়ে আছে। ওর বেশি সেকেণ্ড ক্লাস থেকে আর বোঝা গেল না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছি আমি। আবার সেকেণ্ড ক্লাসে ফিরে এলাম! ঐ মেয়েটাকে একদিন অপমান করতে পারলাম না। অক্ষম পুরুষের মতো এই প্রতিশোধ-কামনার হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি পাইনি।

যুদ্ধ শেষ হল। কনট্রাকটের বাজার মন্দা হয়ে এল। দেশে নিত্য নতুন বেকারে দল বাড়তে লাগল। উত্তেজনা। আন্দোলন। সে ঢেউ এসে ট্রামের গায়ে লাগে। ছে'চল্লিশ সাল এল।

এরি মধ্যে দেখলাম মেয়েটাকে। দিনের বেলা। টালি-গঞ্জের একটা স্টপে। এক বৎসরের ছেলেটাকে কোলে করে সে দাঁড়িয়ে। একবার ফার্স্ট ক্লাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে তারপর ফিরে এসে সেকেণ্ড ক্লাসেই উঠল। সঙ্গে আজ লোকটি নেই।

"টিকিট"—

মেয়েটা তাকাল। আজ তার চোখে সেই আগুন দেখলাম না। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বিষণ্ণ দুটি চোখে সে একবার তাকিয়েই হাতের ছোট্ট একটা মানিব্যাগ থেকে পয়সা বের করতে লাগল।

"ভবানীপুর একটা"—

"কেন? চৌরঙ্গী নয়?" খোঁচা দিয়ে ক্লেশতিক্তকণ্ঠে বললাম। আমার আক্রোশ এখনো যায়নি।

"না," মেয়েটা মুখ তুলল না।

"সেই লোকটা কোথায়?"

"কার কথা বলছেন?"

"আপনার সঙ্গেকার"—

"আমার স্বামী," মেয়েটা ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকাল একবার আমার দিকে। কিন্তু চোখে তার সেই আগুন নেই কেন? কী বিশ্রী চেহারা হয়েছে এখন! সোনার গয়নাও কমে গেছে দেখছি। শাড়িটাও সাধারণ তাঁতের। ব্যাপার কী?

হেসে বললাম, "স্বামী! ওহো—তা তিনি কোথায়?"

"কাজে।"

ব্যঙ্গভরা গলায় বললাম, "কাজে? না পালিয়েছে?"

মেয়েটা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো তাকাল আমার দিকে, তারপর বলল, "আপনি কি চান যে আমি চেঁচাব?"

মুহূর্তের জন্য বোধ হয় মেয়েটার চোখে একটা বন্যভাব ঘনিয়ে এল। দেখে মনে মনে থমকে গেলাম, কিন্তু মুখে একটা বেপরোয়া হাসি ফুটিয়ে অন্য কোনে চলে গেলাম। থাক আর ঘাঁটাব না। তবে শিগগিরই অপমান করার সুযোগ পেয়ে যাব। ধাপে ধাপে যেমন উঠেছিল, তেমনি ধাপে ধাপেই আবার নামতে সুরু করেছে।

আবার সেই করুণ বিষণ্ণ ভঙ্গিটা ফিরে এসেছে মেয়েটির।

ক'দিন পরেই দাঙ্গা শুরু হল। ঝড়ের মতো এল শয়তান। কলকাতার রাস্তায় রক্তের হোলি খেলে হিন্দু মুসলমান। গুলি, অ্যাসিড, বোমা। আর আতঙ্কে শহর কাঁপে, দিনরাত কাঁপে। তার মধ্যে আমাদের ধর্মঘট গেল। এমনিভাবে ছে'চল্লিশ গেল সাতচল্লিশ এল। দেশভাগের আয়োজন শুরু হল।

মনের মধ্যে আরো জ্বালা জমা হল। পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছি। বয়স প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ হল কিন্তু বিয়ে করলাম না, এমন কি কোনো মেয়েকে ভালবাসার চেষ্টা করব সে-ভরসাও হল না। কী হবে তা করে? তাতে শুধু চিত্তে তাপই বাড়ে, দুঃখও বাড়ে। তার চেয়ে ভুলে যাওয়াই ভালো যে পুরুষের জীবনে নারীর দরকার আছে। ওসব আমাদের দরকার নেই। আমাদের মতো গরীবদের ত্যাগ এবং ব্রহ্মচর্যের পাঠ নিয়ে কামিনী-কাঞ্চনের ব্যাপারটা বড়লোকদের

হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। আমাদের ঞ্চনাকে ওরা হিসেব করে পুষিয়ে নেবে।

এমনি যখন মনের অবস্থা হয়ে উঠেছে তখন একদিন সন্ধ্যায় দেখলাম সেই মেয়েটিকে।

"টিকিট ?"

"ছ পয়সা—এসপ্ল্যানেড"—

তাকালাম, "এসপ্ল্যানেড !"

ও মাথা নেড়ে বিষণ্ণভাবে হাসল।

দাঁতে দাঁত ঘষলাম। দাঁড়াও রাক্ষসী, তোমাকে অপমান করার দিন পাব।

কিন্তু কি বিশ্রী হয়ে গেছে মেয়েটা ! কানের রিং দুটো ছাড়া যে আর সোনা নেই গায়ে ! হাতে আবার চুড়ি ফিরে এসেছে, গলায় নকল মোতির মালা।

এসপ্ল্যানেডেই নেমে গেল ও।

তারপর অনেকদিন দেখিনি। অনেক দিন।

লোহার লাইনে শব্দের তরঙ্গ তুলে, আমার ট্রাম যখন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে ময়দানের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে তখন মাঝে মাঝে মেয়েটার কথা বিদ্যুৎ-চমকের মতোই মাথার মধ্যে খেলে গেছে। বোধহয় ময়দানকে দেখেই মনে পড়েছে। দিনের বেলা ময়দানের সবুজ, স্নিগ্ধ আলো-টলমল রূপটি দেখে আমার তার রাতের রূপের কথা মনে পড়েছে। নির্জন, অন্ধকার ময়দানে হয়তো ঐ মেয়েটা এখনো যায়। চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে বা চলতে চলতে কারো গায়ে পড়ে ভাব জমিয়ে হয়তো কোনো কুলি কিংবা কোনো গাড়োয়ানকে বগলদাবা করে ঐ ময়দানেরই কোথায় গিয়ে

মাঝে মাঝে মেয়েটা বসে—তারপর—

"টিকিট করেছেন? আপনার টিকিট? টিকিট মশাই?"

ঢং ঢং—

আমার ট্রাম চলেছে। দিন গেছে, রাত গেছে। তবু আমার ট্রাম চলেছে। ট্রামের চাকার লোহার গান শুনতে শুনতে আমার প্রতিদিন শক্তি বেড়েছে। আমার লোহার রথের উদ্দাম গতি আর যৌবন চাঞ্চল্য আমাকে প্রতিদিনই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে লোহার মতো কঠিন না হলে, লৌহ-যানের মতো একরোখা না হলে কখনো জীবনকে বদলানো যাবে না।

দিন কেটেছে আর একটু একটু বদলেছি।

কিন্তু এর মধ্যে আর দেখিনি সেই মেয়েটাকে। মনে হয়েছে যে আমাকে এড়িয়ে সে গাড়িতে চড়ে তার নৈশ অভিযানে যায়। আমি তার উত্থান-পতনের সেই বিয়োগান্ত কাহিনীর আংশিক সাক্ষী—আমার সামনে দাঁড়াতে যে লজ্জা করে।

কিন্তু দেখা আবার হল। উনপঞ্চাশে। তখন বৈশাখ মাসের শেষ। রাতের বেলা ফিরছি বালিগঞ্জের দিকে। এসপ্লানেড ছাড়তেই কাল বৈশাখী এল। রাস্তায় লোকজন কমে গেছে, রাত নিঃশব্দ হয়ে আসছে, মনের সুখে ঝড় উড়িয়ে হা হা করে ছুটল। কিন্তু কী যায় আসে তাতে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার ট্রাম ছুটল। ড্রাইভার রামবিরিজ দুবের মনেও ঝড়ের দোলা লাগল। ঝড়ের বুক চিরে ট্রাম ছুটল। কিন্তু যাদুঘরের কাছাকাছি স্টপে কে যেন হাত তুলল! থামল ট্রাম। একটি মেয়েলোক উঠল। আবার ট্রাম ছুটল।

"টিকিট"—

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, "পয়সা নেই"—

খেঁকিয়ে উঠলাম, নেই তো উঠলে কেন? নেমে যেতে হবে"—

মেয়েলোকটি আমার দিকে তাকাল। ঝড়ো হাওয়াকে চিরে আমার ট্রাম তখন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে চলেছে হাওয়া এসে চোখের ওপর ঢিলের মতো ঝাপটা মারছে, তবু চিনলাম। সেই মেয়েটি।

"তুমি!"

মেয়েটি বলল, "রাত হয়েছে, বাড়ি ফিরতেই হবে"—

অনেকদিনের আক্রোশ জমা ছিল, বললাম, "একদিন চড় মেরেছিল তোমার সেই দুদিনের নাগর মনে আছে?"

সে বলল, "মাপ করুন দাদা"—

দাদা! বুকের ভেতর যেন হাতুড়ি পড়ল একটা।

মেয়েটি বলে চলল, "আজ কিছুই পাইনি—ওদিকে ছেলেটির জ্বর, একা পড়ে আছে বাড়িতে"—

খুক্ খুক্ করে কাশতে শুরু করল সে। তাকালাম। কালো কুচ্ছিত হয়ে গেছে তার চেহারা, বুড়িয়ে গেছে। ছ বছর আগেকার সেই গালভাঙা' শীর্ণ চেহারা আবার ফিরে এসেছে কিন্তু সেদিন অল্প বয়সের ছাড়পত্র ছিল দেহে, আজ কোনো সম্বলই নেই। সাধারণ মোটা একটা মিলের শাড়ি পরনে। নিরাভরণ।

"দাদা"—

বললাম, "বোসো।"

ঝড়ের শব্দ থেমে গেল আমার কানে। ট্রামের চাকার

লৌহ-সংগীত যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। করুণ, বিষণ্ন সেই পুরনো ভঙ্গিতে বসে রইল মেয়ে। লোক উঠল, নামল, টিকিট দিলাম, পয়সা নিলাম আর তারি ফাঁকে ফাঁকে সেদিন মেয়েটির জীবনের টুক্‌রো টুক্‌রো খবর নিলাম। ছ-বছর ধরে দেখেছিই শুধু, অথচ ওর জীবনের কিছুই তো জানি না।

ওর নাম ছিল বাসনা। মা ছিল না, বাপ কোন ছুতোরের দোকানে কাজ করত। টাইফয়েডে বাপ মরল। ও এল ওর দিদির ওখানে ভবানীপুরে। ভগ্নীপতি কাজ করে কোন মোটর কোম্পানিতে। কিছুদিন বাদেই ভগ্নীপতি কলেরা হয়ে মরল। দুইবোন অন্ধকার দেখে। তিনটি বাচ্চা আছে আবার দিদির। শেষ পর্য্যন্ত দুইবোন রাস্তায় বেরলো। দুজন দুদিকে যেত! পাড়ার মধ্যে ওসব করলে ইজ্জত থাকবে না। এমনি ভাবে চলতে চলতে অবস্থা একটু ফিরল। হঠাৎ কালোবাজারের সওদাগরকে পাকড়াও করে বাসনা। মিথ্যা এক কাহিনীর জৌলসে সওদাগর তাকে আনকোরা ভেবে আলাদা এক ফ্ল্যাটে নিয়ে তুলল। কিন্তু সওদাগরের ফুর্তির দিকেই ঝোঁক। বাচ্চাটা হতেই রস উড়ে গেল তার। তার পর একদিন নিরুদ্দেশ হল সে। আবার সব গেল। হতভাগী ঘর বাঁধতেই চেয়েছিল, ফলে মনের ওপর আঘাত পড়ল। একের পর একগয়না আর টাকা সব গেল। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য গেল। দিদির সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে অন্য বাসা করল্ সে। কিন্তু কঠিন ব্যাধি হল। তা স্বত্বেও আবার নতুন করে বেরোতে লাগল সে, কিন্তু আগের মতো আর জমল না। দেহে ঘুন ধরেছে—

খুক্ খুক্ কাশতে লাগল মেয়েটা। তার তুচোখ দিয়ে জল গড়ায়।

কালীঘাটের মোড় এল।

"যাই দাদা"—নেমে গেল সে। ধুলোয় ঘুর্ণির মধ্যে তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার ট্রাম বিত্যুৎ বেগে এগিয়ে গেল।

ট্রামের চাকায় চাকায় হঠাৎ যেন শব্দ উঠল—দাদা-দাদা দাদা"—

তারপর আরো তুবার দেখা হয়েছিল।

প্রথমবার দিনের বেলা। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের কাছে সঙ্গে তার ছেলে।

ছেলেটাকে সেই কবে দেখেছিলাম। এখন সে পাঁচ বছরের। রোগা খিটখিটে।

"চড়ব দাদা—জ্বর হয়েছে, আর হাঁটতে পারছি না।"

"ওঠ"।

উঠে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। সংকোচে।

বললাম, "বসো।"

বসল। সেই করুণ, বিষণ্ণ ভঙ্গিতে। চোখের দৃষ্টিতে আর সেই ধার নেই। ঘোলাটে, মৃত দৃষ্টি। খুক্ খুক্ করে কেশে বাইরের দিকে তাইয়ে রইল।

ছেলেটা নাকিস্থরে কঁদেতে লাগল সারা রাস্তা, "খিদে পেয়েছে—কখন খেতে দিবি ? বল্ না, কখন খেতে দিবি ? এই রাককুসী"—

সমানে শুনে গেল মেয়েটা। নড়ল না, কথাটি বলল না। শেষ দেখা 'পূর্ণ'র সামনে। ফুটপাতে ছেলেটাকে নিয়ে বসে আছে। ছেলেটা ভিক্ষে চাইছিল, "ও বাবু—খিদেয় মরে

যাচ্ছি, বাবু ও বাবু—”

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দেখেছিলাম। তারপর ট্রাম ছেড়ে দিয়েছিল। ফিরেও তাকাইনি। তাকালেই ‘দাদা, ডাকটা মনে পড়ে। তার চেয়ে না তাকানোই ভালো।

এর পর মেয়েটাকে আর দেখিনি। কিন্তু ছেলেটাকে দেখেছিলাম মাস ছয় পরে। পঞ্চাশ সালে।

একজন কনেস্টবল ছেলেটাকে নিয়ে কালীঘাটের মোড়ে আমার ট্রামে উঠল।

যাত্রীরা প্রশ্ন করল, “কি ব্যাপার? চুরি করেছে?

কনস্টেবল মাথা ঝাঁকল, “উহুঁ ওর মা মরেছে—”

কেন? কি হয়েছিল?”

“ব্যামো। ঘরে মরে পড়ে ছিল—এই ছোড়া কাঁদছিল—যাচ্ছি থানায় নিয়ে রিপোর্ট দিতে।”

“তা এখন কি হবে ছেলেটার?”

“ওর কে এক মাসি আছে—সেখানে যাবে। সরকার এখন দেশশুদ্ধ অনাথের বোঝা বইবে নাকি?”

“ততো নিশ্চয়ই সিপাইদাদা—তা কি করে বইবে।”

ছয়মাস আগে ছেলেটাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। আজ কিন্তু ছোঁড়া কাঁদল না।

কিন্তু আশ্চর্য্য। মেয়েটা মারা গেল। সেই কবে থেকে দেখে আসছিলাম। কত চেনা হয়ে গিয়েছি!

ট্রামের চাকায় যেন প্রতিধ্বনি উঠল, “দাদা—দাদা—দাদা—

তবু কিছু করতে পারলাম না ছেলেটার দিক থেকে মুখটা [illegible]ই নিলাম।

সেই ছেলেটা একটু আগে জগুবাবুর বাজারে যে আমাকে

গাল দিয়ে নেমে গেল কিন্তু ও থাকে কোথায়? মাসির ওখানে? নিশ্চয়ই না ও থাকে রাস্তায়, ফুটপাথে, এ-বাড়ি ও-বাড়ির বারান্দায়। স্বাধীন কুকুর কিংবা ইঁদুরের মত।

ট্রামটা থামল। আমার ট্রাম এখন ড্যালহাউসি ছুঁয়ে আবার বালিগঞ্জে ফিরছে। ভিড় কম।

যাদুঘরের স্টপ থেকে একটি মেয়ে উঠল সেকেণ্ড ক্লাশে।

"টিকিট।"

মেয়েটি তাকাল, বলল, "কালীঘাট।"

টিকিট দেবার সময় চিনতে পারলাম। সেই একই চোখের চাউনি।

বাসনারই মতো আর একটি মেয়ে। বাসনা মরলেও ওদের দল বাড়ছে। সবংশে।

মুখটা ফিরিয়ে নিলাম। ট্রামের চাকার লোহার গান শুনতে শুনতে দাঁতে দাঁত ঘসলাম। আমার প্রতি নখের ডগা দিয়ে যেন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বেরোতে চাইল। কিন্তু তবু কিছুই করতে পারলাম না। শুধু একজন যাত্রীর কাছে গিয়ে হঠাৎ অকারণে চেঁচিয়ে উঠলাম, "টিকিট—টিকিট মশাই?"